মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর রচনাবলীতে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

মাসরুরুল হক
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ ও শিক্ষাবর্ষ- ৯৯/৯৯-২০০০
ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মিসেস জীনাত আরা সিরাজী
সহ-তত্ত্বাবধায়ক ও সহযোগী অধ্যাপক
ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

য়ের এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর, ২০০৬

RB
B
891.444
HAM

Dhaka University Institutional Repository

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর রচনাবলীতে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

GIFT

মাসরুরুল হক
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ ও শিক্ষাবর্ষ- ৯৯/৯৯-২০০০
ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

425551

ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মিসেস জীনাত আরা সিরাজী
সহ-তত্ত্বাবধায়ক ও সহযোগী অধ্যাপক
ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
425551
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর, ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারপত্র

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর রচনাবলীতে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ করি নি এবং অন্য কোন ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কোথাও উপস্থাপন করি নি।

(মাসরুরুল হক)
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ ও শিক্ষাবর্ষ ৯৯/১৯৯৯-২০০০
(বরকতুল্লাহ উর্দু বিভাগ)
ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

425551

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারপত্র

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর রচনাবলীতে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ করি নি এবং অন্য কোন ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কোথাও উপস্থাপন করি নি।

(মাসরুরুল হক)
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ ও শিক্ষাবর্ষ ৯৯/১৯৯৯-২০০০
ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

425551

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Phone : Off. 4290

Dhaka University Institutional Repository

DEPARTMENT OF ARABIC
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH

No.....

Date.....

প্রত্যায়নপত্র

মাসরুরুল হক, এম.ফিল. গবেষক, ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক *মোহম্মদ বরকতুল্লাহর রচনাবলীতে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য* শীর্ষক শিরোনামে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছেন। এটি তার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩০/৫/০৭

(ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

425551

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Department of Persian & Urdu
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

ফার্সি ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Date.....

No.....

প্রত্যয়নপত্র

মাসরুরুল হক, এম.ফিল. গবেষক, ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ***মোহম্মদ বরকতুল্লাহর রচনাবলীতে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*** শীর্ষক শিরোনামে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছেন। এটি তার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

Z. A. Sirazi
30.5.07

(মিসেস জীনাত আরা সিরাজী)
সহ-তত্ত্বাবধায়ক ও সহযোগী অধ্যাপক
ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Phone : 9661900-19 Ext. 4320 9661920-73 Ext. 4320 (direct) Fax : 880-2-8615583 E-mail : duregstr@bangla.net
Web : //www.univdhaka.edu

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর রচনাবলীতে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য শীর্ষক আমার এম.ফিল. থিসিসটি রচনার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকারী তত্ত্বাবধায়ক মিসেস জীনাত আরা সিরাজী, সহযোগী অধ্যাপক, ফার্সি ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর কাছে যাদেরকে আমি গবেষণার প্রয়োজনে সময়ে অসময়ে বিরক্ত করেছি। যেখানেই সমস্যা মনে হয়েছে সেখানেই তাদের দ্বারস্থ হয়েছি। তারা আমাকে সবসময় সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। তাদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনার ফলে আমি থিসিস সম্পাদন করতে পেরেছি। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে যারা গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলক্ষেত্রে আমাকে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। এক কথায় তাদের অনুপ্রেরণা ও সহায়তা না পেলে আমার গবেষণা হত কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে গবেষণা বিষয়ে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক স্যারের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও মূল্যবান পরামর্শে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ড. কাজী নূরুল ইসলাম স্যারকে যার কাছ থেকে থিসিস সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বার বার পরামর্শ নিয়েছি। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি ও উর্দু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভূইয়া ও প্রভাষক গোলাম রাব্বানীকে যারা অকৃপণভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন সকল ক্ষেত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

আমি এম.ফিল গবেষণায় অণুপ্রাণিত হয়েছিলাম আমার জান্নাতবাসিনী মায়ের অণুপ্রেরণায়। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় থিসিস রচনার কাজ আমি সম্পন্ন করতে পারি নি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে মাকে স্মরণ করছি ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মোঃ মাযহারুল হক, এসিসট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড-কে যিনি এম. ফিল. রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে শেষ হওয়া অবধি উদাত্তভাবে আমাকে সহযোগিতা করে এসেছেন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার প্রিয়তমা স্ত্রী শামছুন নাহার মাকছুদা, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা, দুর্গাপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা-কে যার অবদানে আমার পক্ষে থিসিস রচনার ক্ষেত্রে বিরাট সফলতা এসেছে। কম্পোজ করা থেকে শুরু করে প্রুফ দেখা সর্বোপরি সকল ক্ষেত্রে যার সহযোগিতা ছিল অতুলনীয়। আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ।

থিসিস রচনার সময় মোহম্মদ বরকতুল্লাহ সাহেবের জেষ্ঠ্য পুত্র জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। এ সুযোগে তাকেও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। যে সকল গুরুজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জন আমাকে অণুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। এই গবেষণা করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, জাতীয় যাদুঘর গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন পত্রিকা অফিস থেকে বই ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করেছি। ঐসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

মাসরুরুল হক

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা ১-২

প্রথম অধ্যায় ৩-১৪

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর জীবন ও দেশকাল

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫-৪৫

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দৃষ্টিতে হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর নেতৃত্ব ও কারবালার যুদ্ধ

তৃতীয় অধ্যায় ৪৬-৭৯

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দর্শন চিন্তার স্বরূপ এবং বাংলা ভাষায় দর্শন চিন্তার ধারায় তাঁর অবদান

চতুর্থ অধ্যায় ৮০-১০৭

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য চর্চা

উপসংহার ১০৮-১১০

পরিশিষ্ট

ক. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর মৃত্যু পরবর্তী সমালোচনা, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ১১১-১১৫

খ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর গ্রন্থাবলী ১১৬

গ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর অগ্রন্থিত রচনাবলী ১১৬-১১৮

ঘ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহ ১১৮

ঙ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর অভিভাষণ ১১৮-১১৯

চ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর অপ্রকাশিত রচনাবলী ১১৯

ছ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তৎকালীন সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা ১২০-১৩০

জ. প্রাপ্ত পুরস্কার ও খেতাব ১৩১

ঝ. গ্রন্থপঞ্জি ১৩২-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বিশ শতকের বাংলা ভাষার মুসলিম লেখকেরা চিন্তার ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি সাধন করেন। এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ, মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের বিপ্লব, ১৯১৭ সনের রুশ বিপ্লব এবং ইউরোপে রেনেসাঁসের প্রভাব। বাংলার মুসলিম লেখকেরা বিশ শতকের শুরু থেকেই মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্ম ও জীবন জগতকে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। চিন্তার এই ইতিহাস অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ এ ধারারই একজন অসাধারণ চিন্তক। বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখকদের চিন্তার বিকাশ এবং এই ধারায় মোহম্মদ বরকতুল্লাহর চিন্তার অসাধারণ গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমি বর্তমান গবেষণায় অগ্রসর হই। বরকতুল্লাহ দর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর রচনাবলীতে সর্বত্রই দর্শন-মনস্কতার পরিচয় আছে। ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের নানা বিষয় নিয়ে তিনি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইসলামকে তিনি আধুনিক শিক্ষার আলোকে নিজের মত করে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়াও দর্শনের নানা সমস্যা ও মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের নানা বিষয় তাঁর রচনাবলীর বিষয়বস্তু হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের নাম থেকে তাঁর রচনাবলীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা যায়। গ্রন্থগুলো হল ঃ *পারস্য প্রতিভা* (১ম খণ্ড-১৯২৪, ২য় খণ্ড-১৯৩২), *মানুষের ধর্ম্ম* (১৯৩৪), *কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত* (১৯৫৭), *নবী গৃহ সংবাদ* (মক্কা খণ্ড-১৯৬০), *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* (১৯৬৩), *হযরত ওসমান* (১৯৬৯)।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর ভাষা ও রচনারীতি অলংকারসমৃদ্ধ, রূপ ও রীতির দিক দিয়ে ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং কিছুটা কাব্যিক। কালি প্রসন্ন ঘোষ-এর *প্রভাত চিন্তা*, *নিভৃত চিন্তা*, *নিশীত*

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা প্রভৃতি গ্রন্থের রচনারীতি ও ভাবধারার দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে পরিদৃষ্ট হয়। বরকতুল্লাহর রচনাবলী বাংলা ভাষার অক্ষয় সম্পদ। আমি চেষ্টা করেছি বরকতুল্লাহর চিন্তার মর্ম ও নানামুখী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে। বরকতুল্লাহর সাহিত্য কর্মকে চারটি অধ্যায় এবং একটি পরিশিষ্টে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তাঁর জীবন ও দেশকাল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর দৃষ্টিতে হযরত মোহম্মদ (সাঃ)-এর নেতৃত্ব ও কারবালার যুদ্ধ, তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর দর্শন চিন্তার স্বরূপ এবং বাংলা ভাষায় দর্শন চিন্তার ধারায় তাঁর অবদান এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য চর্চা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। পরিশিষ্টে বরকতুল্লাহর মৃত্যু পরবর্তী সমালোচনা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, তাঁর গ্রন্থাবলী, অগ্রন্থিত রচনাবলী, গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহ, অভিভাষণ, অপ্রকাশিত রচনাবলী, তাঁর প্রকাশিত রচনাবলী সম্পর্কে তৎকালীন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা, প্রাপ্ত পুরস্কার ও খেতাব সংযোজিত হয়েছে। সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জির তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এম. ফিল ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে এই গবেষণা সম্পন্ন করেছি বলে আমাকে একটা যৌক্তিক শৃংখলার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। এ বিষয়ে পাঠকদের মনে আরো অনুসন্ধানের ও বিচার বিশ্লেষণের তাগিদ দেখা দিলে আমি আমার শ্রমকে সার্থক মনে করব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর জীবন ও দেশকাল

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ তদানীন্তন পাবনা জেলার, বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার ঘোড়াশাল গ্রামে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী আজম আলী এবং মাতার নাম তসিরন বিবি।[১]

হাজী আজম আলী একজন কবিরাজী চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র-জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ রহমতুল্লাহ ও কনিষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ বরকতুল্লাহ এবং এক কন্যা কদরজান। হাজী আজম আলী সে যুগেই শিক্ষিত ও ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যার শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।[২]

জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহম্মদ রহমতুল্লাহ পড়ালেখা শেষ করে নিজ গ্রামেই এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। সাংসারিক জীবনের পাশাপাশি তিনি কাব্য ও সাহিত্য চর্চা করেছেন মর্মেও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর কিছু অপ্রকাশিত লেখাও পাওয়া যায়, যা বেশ উন্নতমানের ছিল। লেখাগুলো প্রকাশনার উপযোগী থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং শহর থেকে দূরে অবস্থানের কারণেই হয়তবা সেদিকে অগ্রসর হন নি। তবু তিনি যে লিখেছেন এতে তাঁর সৃজনশীল মানসিকতারই পরিচয় মেলে।[৩]

বরকতুল্লাহ শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ঘোড়াশাল গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বেলতৈলের এম.ই.(মিডল ইংলিশ) স্কুলে ভর্তি হন। তিনি স্কুলে সব সময়ই প্রথম হতেন এবং ১৯০৬ সালে নিম্ন তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১০ সালে এম.ই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে চার বৎসরের জন্য মিডল ইংলিশ (এম.ই) বৃত্তি লাভ করেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং ঐ বৎসরই শাহজাদপুর হাই ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হন। এখানেও তিনি পূর্বের মতই প্রথম স্থান অধিকার করে পাস করতে থাকেন এবং ১৯১৪ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন।[৪]

বরকতুল্লাহ ১৯১৬ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে বিভাগীয় বৃত্তিলাভ করে প্রথম বিভাগে আই এ পাস করেন এবং ১৯১৮ তে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে দর্শন বিষয়ে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন।[৫] তাছাড়া তিনি ১৯২২ সালে আইনে বি.এল ডিগ্রী এবং ১৯২৩ -এ ওকালতির সনদ লাভ করেন।[৬]

১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত বি.সি.এস. (বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষায় হিন্দু-মুসলিম প্রার্থীদের সম্মিলিত তালিকায় বরকতুল্লাহ পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রথমে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হিসেবে চাকুরীতে যোগ দেন। এ চাকুরীতে তিনি বেশী দিন বহাল থাকেন নি। কর্মক্ষেত্রে নিজেকে মানসিক দিক থেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এ বিভাগ ছেড়ে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন শাখায় যোগ দেন। ১৯২৪ সালে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হিসেবে তাঁর চাকুরি জীবন শুরু হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি হুগলীর শ্রীরামপুর ও কুমিল্লার ব্রাহ্মনবাড়িয়াসহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করেন।[৭]

১৯৩৬-৩৭ সালে এস.ডি.ও হিসেবে তিনি জামালপুরে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৮-৩৯ এ এস.ডি.ও হিসেবে ছিলেন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। এরপর কলকাতায় অবস্থান করেন। তিনি কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ সি.সি.আর.আই. ডিপার্টমেন্টে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৯-৪৫ সালে সিভিল সাপ্লাই বিভাগে সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারীতে তৎকালীন খুলনা জেলার বাগেরহাটে এস.ডি.ও. হিসেবে যোগদান করেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলি হন ফরিদপুর জেলায়। ১৯৪৮ সালের ২২ আগষ্ট জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলি হন কুষ্টিয়ায়। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সালে আবার যোগদান করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে ময়মনসিংহে। ১৯৫০ সালের ১৭ অক্টোবর জেলা প্রশাসক হয়ে আসেন বরিশালে। ১৯৫১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে এর বিশেষ কর্মকর্তার (পরিচালক) দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।[৮]

ছাত্র জীবন থেকেই বরকতুল্লাহর সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন। এ সম্পর্কে একটি সাক্ষাতকারে তিনি নিজেই উল্লেখ করেন, "আল্লাহর কাছে অজস্র শুকরিয়া ছেলেবেলা থেকেই আমার স্মরণশক্তি যথেষ্ট প্রখর। পাঠ্য বই পড়তে আদৌ সময় লাগতো না, একবার পড়লেই মনে থাকতো। ফলে, বাধ্য হয়ে অবশিষ্ট সময়ে বাইরের বইপত্র পড়েই সময় কাটাতে হতো।"[৯] মহান স্রষ্টা প্রদত্ত এই অসাধারণ গুণ মোহম্মদ বরকতুল্লাহকে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত অধ্যয়নের সুযোগ করে দেয়। আর তিনি পরিপূর্ণভাবে এ সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন মেধা ও মননশীলতার মাধ্যমে। ১৯০৮-১০ সালের কথা, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখনই তিনি *পদ্মলহরী* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ লিখেন।[১০] ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ইচ্ছে ছিল সাহিত্যের সেবা করা এবং সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর এ ইচ্ছাশক্তি এবং সুন্দর মেধা ও মননশীলতাই তাকে বাংলা সাহিত্যের বিশাল অংগনে স্থান করে দিয়েছে ।

১৯১৪ সালে বরকতুল্লাহ রাজশাহী কলেজে পদার্পনের সূচনালগ্নেই ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। মহাযুদ্ধের সময়ে অবিভক্ত বাংলাসহ ভারতবর্ষে কোন বিশৃংখলা দেখা দেয় নি। দেশবাসীর জীবন-প্রণালী ছিল স্বাভাবিক। পদ্মা বিধৌত রাজশাহীর পরিবেশ ছিল শান্ত। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে রাজশাহীর পরিবেশ ছিল অনুকূল। সে সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহীতে *বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি*'র প্রচেষ্টায় একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। এই সমিতির প্রথিতযশা বরেণ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রাজশাহী বারের একজন বিশিষ্ট আইনজীবি ছিলেন। তিনি বক্তৃতায়ও বেশ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা প্রতিভা ও ক্ষুরধারযুক্তি তৎকালীন সময়ে ছাত্র জনতাকে অনুপ্রাণিত করতো। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক রমাপ্রসাদচন্দ, অধ্যাপক ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তরুণ বয়সেই মোহম্মদ বরকতুল্লাহ এসব মহান ব্যক্তিদের বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনা শুনার এবং তাদের সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পান। এই প্রেক্ষাপটটিই তাঁকে সাহিত্য চর্চার প্রতি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।[১১]

রাজশাহী কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় বরকতুল্লাহ প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। *পদ্মাবক্ষে* এবং *ভগ্নদেউল* নামে তাঁর দুটি প্রবন্ধ রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিনে যথাক্রমে ১৯১৬ ও ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। এ দুটো প্রবন্ধের জন্য তিনি পুরস্কৃত হন। ১৯১৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা *আল এসলাম*-এ প্রকাশের জন্য *ছাত্রসমাজে জাতীয়তা* নামে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। তরুণ বয়সে ছাত্রাবস্থায় তৎকালীন সময়ে *আল এসলাম*-এর মত পত্রিকায় লেখা পাঠানো নিঃসন্দেহে তাঁর জন্য ছিল একটি দুঃসাহসের কাজ। *আল এসলাম* পত্রিকার সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী আগ্রহের সাথে লেখাটি ছেপে দেন এবং প্রবন্ধের নীচে প্রশংসামূলক মন্তব্য লিখে দেন। মূলত এখান থেকেই বরকতুল্লাহর সাহিত্য রচনার হাতেখড়ি।[১২]

১৯১৫ সালের মার্চে রাজশাহীতে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন তৎকালীন সময়ে জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা *সবুজপত্র*-এর সম্পাদক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্য সম্মেলনে ঢাকা ও

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতাসহ ভারতবর্ষের প্রথিতযশা অসংখ্য কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। বরকতুল্লাহ এই সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্বপালন করার সুবাদে অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের একত্রে দেখার সুযোগ লাভ করেন এবং সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত হন।[১৩]

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ছাত্র জীবনে এম. আনসারী ছদ্মনামে *আল এসলাম* পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩২৪ সংখ্যায় *অর্ঘ্যভার হযরতের প্রতি* নামে একটি কবিতা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এম. আনসারী ছদ্মনামে তিনি *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় সাহিত্যে বৈচিত্র্য* (কার্তিক ১৩২৮), *তপোবল* (মাঘ ১৩২৮) এবং *কবি সংবর্ধনা* (বৈশাখ ১৩২৯) নামক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১৪]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. ক্লাশে অধ্যয়নরত অবস্থায় বরকতুল্লাহ বিখ্যাত *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোঃ নাসিরুদ্দিনের সাথে পরিচিত হন। সম্পাদকের অনুরোধে তিনি মাসিক *সওগাত* পত্রিকায় দর্শন বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। *ধ্রুব কোথায়* নামক তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধটি ১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে *সওগাত* এর সংখ্যাসমূহে প্রকাশিত হয়। *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক নাসিরুদ্দিনের মতে, "এটি বাঙ্গালী মুসলমানদের রচিত প্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ।" *ধ্রুব কোথায়* প্রবন্ধটি ১৯৩৪ সালে *মানুষের ধর্ম্ম* নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ হরিদাস ভট্টাচার্য্য। ভূমিকায় বরকতুল্লাহর প্রতি তাঁর প্রশংসাসূচক কথাগুলো ছিল, "লব্দ প্রতিষ্ঠ লেখক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ সাহেবের "*মানুষের ধর্ম্ম*" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে সাহিত্যিক মাত্রেই যে আনন্দিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা সাহিত্য যে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন তাহার বর্দ্ধমান বৈচিত্র্য।"[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল লেখক বঙ্গ সাহিত্যকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছেন *পারস্য প্রতিভা'* গ্রন্থের লেখক বরকতুল্লাহ তাদের অন্যতম। লেখকের ভারতীয়, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যুৎপত্তি কোথাও তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করে নাই বরং তাকে পুষ্ট ও সহজ করেছে।

ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য বইপুস্তক অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণের ফলে তাঁর মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি গভীরভাবে অবলোকন করেছেন মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছে। পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতির উন্নয়নের জন্য তিনি চিন্তা করতেন। তিনি চেয়েছিলেন সাহিত্য সেবার মাধ্যমে জাতির খেদমত করতে। তিনি মুসলিম ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। যার প্রমাণ মেলে *পারস্য প্রতিভা*, *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ* সহ অন্যান্য গ্রন্থে ।[১৬]

ইংরেজ আমলে বাঙালী মুসলিম সমাজ যখন আত্মগৌরব ভুলে গিয়ে অধঃপতিত জাতিতে পরিণত সে সময়ে কয়েকজন মুসলিম লেখক কলকাতায় একত্রিত হয়ে দিশেহারা মুসলিম জাতিকে আত্মসচেতন ও ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করে তোলার জন্য ব্রতী হন। তারা *সুধাকর* পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামের মর্মবাণী ও গৌরবময় অধ্যায়ের বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করেন। *সুধাকর* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সকল লেখক একত্রিত হয়েছিলেন তাদেরকে অনেকেই *সুধাকর দল* নামে অভিহিত করেছেন।[১৮]

মূলত এ সকল কবি সাহিত্যিকরাই বাংলা সাহিত্যে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[১৯] পরবর্তীকালে এই *সুধাকর দল* এর অনুসৃত পথে অনেক মুসলিম লেখক যাত্রা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ মূলত এ ধারারই লেখক। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "এ যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বাঙালী মুসলমানের কাছে বরকতুল্লাহ একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের বাণী নিয়ে উপস্থিত। তাঁর সাহিত্য সাধনা মুসলমানের জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি তাদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারণের পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছে।"[২০]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারায় বরকতুল্লাহ একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেন। তিনি রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৫), কালী প্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০), প্রমথ চৌধুরী (১৮৭৩-১৯৪৯), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) সহ সমসাময়িক কিছু প্রথিতযশা লেখকের অনুসারী ছিলেন। বরকতুলাহ্ দর্শন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। রাজকার্যের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর ভাষা শিল্পী। *পারস্য প্রতিভা* ও *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থ দুটো কবিত্বময় গদ্য আকৃতিতে লেখা। যার ফলে গ্রন্থ দুটো পাঠককে আকৃষ্ট না করে পারে না। সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বে তাঁর লেখায় যে গতিশীলতা ছিল শেষ পর্বে তিনি তা সম্পূর্ণ বজায় রাখতে পারেন নি।[২১]

পারিবারিক পরিবেশ বরকতুললাহর মানস গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । তাঁর পিতা ছিলেন একজন শিক্ষিত ও ধার্মিক ব্যক্তি। সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তিনি পরিবার থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।[২২]

লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ সালে বাংলা বিভক্ত হলে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তা তৎকালীন ছাত্রসমাজকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে উজ্জীবিত করে। বরকতুল্লাহ এক্ষেত্রেও সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত হন। প্রতি শনিবার বেলতৈল স্কুলে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ হতো। সভায় দেশাত্ববোধক গান, প্রবন্ধ ও কবিতা পড়া হতো। নিয়মিত স্কুলে ব্যায়াম ও কুস্তির প্রচলন ছিল । বরকতুল্লাহ নিজেই স্বীকার করেন,

> স্বদেশী কর্মীদের সঙ্গে কিছুকাল কাজ করায় আমি ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছিলাম কারণ তাদের দেখাদেখি দেশপ্রেম ও জনসেবামূলক প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতে ঐ সময় অভ্যস্ত হই। তাছাড়া বহু গ্রন্থ পাঠের জন্য প্রেরণা পাই; গ্রন্থও পাই এবং দেশ বিদেশের কথা পড়ে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। তার ফলেই এম-ই পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগে আমি বাংলায় ফার্স্ট হয়েছিলাম এবং বিভাগীয় ইন্সপেক্টর হতে

Dhaka University Institutional Repository

> কয়েকখানি বই পুরস্কার পেয়েছিলাম। নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা ও চারিত্রিক সংযম শিক্ষার ফলে আমার দেহ ও মন সুগঠিত ও কষ্টসহ হয়েছিল।[২৩]

তিনি যখন শাহজাদপুর হাই স্কুলের ছাত্র তখন ফারসী শিক্ষকদের কাছ থেকে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস ও মুসলিম সেনানায়কদের বীরত্বের কাহিনী শুনে তার মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।[২৪] বরকতুল্লাহ যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন কয়েকজন বন্ধু সহপাঠীকে নিয়ে *দুঃখিনী* নামে হাতে লেখা একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[২৫]

কলকাতা নগরীতে অবস্থানকালীন সময়ে বরকতুল্লাহ মুসলিম লেখকদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি*'র সদস্য হন এবং সমিতির মুখপত্র *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*'র লেখক শ্রেণীতেও অন্তর্ভূক্ত হন। এ সময়ে তিনি পরিচিত হন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), কমরেড মুজাফফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), ডাঃ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৪), ফজলুল হক সেলবর্ষী (১৮৯৩-১৯৬৮) প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে। পরবর্তীতে বরকতুল্লাহ *মোসলেম ভারত* সহ আরো দু-একটি পত্রিকায় লেখা দিতেন।[২৬]

চাকুরিজীবনেও মোহম্মদ বরকতুল্লাহ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকালে তিনি ঐ সকল জেলা হতে প্রকাশিত পত্রিকায় লেখা প্রদান করতেন। এমনকি মফস্বল শহর ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত সৈয়দ আবদুর রব সম্পাদিত *মোয়াজ্জিন* পত্রিকাতেও তিনি লেখা দেন। মূলত পত্রিকাটি চালু রাখার জন্যই তিনি লেখা দিতেন। *মোয়াজ্জিন* পত্রিকায় লেখার সূত্র ধরেই সরকার থেকে লেখার ব্যাপারে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

মোয়াজ্জিন-এ প্রকাশিত লেখা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> ঐসব প্রবন্ধে আমি মুসলিম সমাজের অজ্ঞতা ও দৈন্যের দরুণ শোচনীয় অবনতির কথা তীব্র ভাষায় আলোচনা করতাম। এলাহাবাদ হতে ইংরেজীতে প্রকাশিত প্রবর্তক নামক এক হিন্দী পত্রিকায় সেসব লেখার উদ্ধৃতি বের হতো। তাতে মুসলিম সমাজে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তারই ফলে আমার উপর চীফ সেক্রেটারী হতে আসে নিষেধাজ্ঞা।[২৭]

একদিকে রাষ্ট্রীয় কাজের চাপ অন্য দিকে উপর মহলের নিষেধাজ্ঞা তাঁর সাহিত্য চর্চায় ব্যঘাত ঘটায়।

ভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমী গঠনকর্মে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা থেকে বাংলা ভাষার প্রতি তার আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা একাডেমীতে স্পেশাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটিকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক পরিশ্রম করেন। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।[২৮]

বাংলা একাডেমীতে দায়িত্ব পালনকালে অর্থাৎ স্পেশাল অফিসার পদের বেতন ছিল ১২৫০ টাকা। এ থেকে পেনসন বাবদ ৭০০ টাকা বাদ দিয়ে তিনি পেতেন ৫৫০ টাকা। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই লিখেছেন, "পুনর্নিয়োগক্ষেত্রে ফাইনান্সের নিয়ম সূত্রে আমি আমার সাবেক বেতন ২১০০ টাকা পেতে অধিকারী ছিলাম কিন্তু প্রিয় মাতৃভাষা ও স্ব-জাতির জন্য ইহা একটি মূল্যবান গঠনমূলক কাজ বলে, বেতন সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই আমি তুলি নাই।"[২৯] এ ঘটনার মাধ্যমে তাঁর স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠে।

বরকতুল্লাহ ছিলেন মানবদরদী, আদর্শবান ও ধর্মপরায়ণ। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর আচরণে কখনো কোন পদগরিমা প্রকাশ পেতোনা। আড়ালেই থাকতে ভালোবাসতেন তিনি। বস্তুত তিনি ছিলেন প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

Dhaka University Institutional Repository

গুণীর বিনয় ছিলো তাঁর চরিত্রে। তাই তিনি কখনো নিজেকে জাহির করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নি।[৩০]

পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতির কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য বরকতুল্লাহ গভীরভাবে চিন্তা করতেন। কর্মব্যস্ততার মধ্যে সুযোগ পেলেই তিনি তাদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতেন। তবে তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কখনও উত্থাপিত হয় নি। তিনি নীতিতে ছিলেন অটল। সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন কাজ তিনি জেনে বুঝে করেন নি। অপরাধীদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ১৯৩৩ সালে ঢাকায় ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তার বাসা ছিল জেলখানা সংলগ্ন। যে সব আসামীর ফাঁসি হতো সেগুলিতে উপস্থিত থাকার ভার পড়তো তাঁর উপর। বরকতুল্লাহ যেদিন ফাঁসির দৃশ্য দেখতেন সেদিন আর খেতে পারতেন না। তাঁর বাসার অন্য সদস্যরাও সারাদিন বিমর্ষ হয়ে থাকতো।[৩১] এ ঘটনা থেকে তার সহানুভূতিমূলক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ১৯৭৪ সালের ২ নভেম্বর ৭৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। বরকতুল্লাহর মৃত্যুর পর *দৈনিক বাংলার বাণী* তাদের সম্পাদকীয়তে এই নিরহংকারী ও জ্ঞানানুরাগী লেখককে আমাদের 'জাতীয় গৌরব ও সম্পদ' বলে যে মন্তব্য করেছিল তা সত্যিই যুক্তিযুক্ত ছিল।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১. 'জীবন-স্মৃতি', মোহম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ রচনাবলী (৩য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫৩।

২. গোলাম সাকলায়েন, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৯।

৩. 'জীবনকথা', প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী, মোহম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮৫

৪. 'জীবন-স্মৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮। গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন বরকতুল্লাহ্ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ পাস করেছিলেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯। 'জীবন-স্মৃতি' অনুযায়ী এ তথ্য সঠিক নয়।

৬. 'জীবন-স্মৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

৭. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৬০-৬১

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮। গোলাম সাকলায়েন বরকতুল্লাহ্র অবসর গ্রহণের তারিখ ২-৩-১৯৫৩ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৯. 'জীবনকথা', মোহম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩৭

১০. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, 'গদ্যশিল্পী মোহম্মদ বরকতুল্লাহঃ জীবন ও সাহিত্য সাধনা', সাহিত্যিকী, শরৎ ১৩৭৫, পৃ. ৬৩

১১. 'জীবন-স্মৃতি' , প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫৭-৫৮

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭-৫৮

১৩. 'জীবন-স্মৃতি' , প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫৭-৫৮

১৪. 'জীবনকথা', প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী, মোহম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮৫

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

১৮. মোহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৪, পৃ. ১৩৫-৩৬

১৯. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ২৯৯

২০. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, সাহিত্য-সমীক্ষা, মুক্তধারা, ১৯৭৬, পৃ. ১৭৩

২১. ড. হাবিব রহমান, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ জীবন ও সাহিত্য সাধনা, ইউনিভার্সিটি বুক কর্ণার, ১৯৯৮,পৃ. ২

২২. গোলাম সাকলায়েন, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৯

২৩. 'জীবন-স্মৃতি' মোহম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী (৩য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫৩

২৪. 'জীবন-স্মৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৫৭

২৫. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২৬. 'জীবন-স্মৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯-৬০

২৭. 'জীবন-স্মৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

৩০. মোহম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ রচনাবলী ২য় খণ্ডের শেষে সংকলিত, বাংলা একাডেমী ১৯৯১ পৃ. ৪৫১

৩১. 'জীবন-স্মৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

৩২. বরকতুল্লাহ্ (২য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দৃষ্টিতে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর নেতৃত্ব ও কারবালার যুদ্ধ

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর জীবন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নেতৃত্ব ও কৃতিত্ব নিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম লেখক ছাড়াও অনেক অমুসলিম লেখক বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। এক্ষেত্রে বাঙালী লেখকদের অবদান অনস্বীকার্য। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতানের (আনুমানিক ১৫৫০-১৬৪৮) *নবী বংশ* থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় নবীর চরিত্র মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ পর্যন্ত রচিত রসূলজীবনীসমূহের মধ্যে যে ক'টি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে মুহম্মদ বরকতুল্লাহর *নবী গৃহ সংবাদ* (১৯৬০) ও *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* (১৯৬৩) উল্লেখযোগ্য। *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* গ্রন্থটি লেখকের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও সাধনার ফসল। সাহিত্যমোদী ব্যক্তিদের প্রস্তাব হিসেবে তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে উপাত্ত সংগ্রহ করে গ্রন্থটি রচনা করলেও তিনি নবী-জীবন সম্পর্কে সবকিছু বলতে পেরেছেন এ দাবী করেন নি। *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* গ্রন্থটি ১৯৬৩ সালে গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী ৩৪, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ১৯৬৩ সালে নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ গ্রন্থের জন্য দাউদ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। যথেষ্ট জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও নবী জীবনের অনেক বিষয় নির্ণয়ে তিনি কিছুটা অলৌকিকত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন সত্য কিন্তু বিচারের পথ পরিহার করেন নি। উক্ত গ্রন্থে বরকতুল্লাহ প্রধানত যুক্তি এবং তথ্যের আলোকেই আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি আঠারটি পরিচ্ছদে রচিত। এ গ্রন্থে বরকতুল্লাহ মহানবী (সাঃ)-এর হিযরতের সময় থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাসুল (সাঃ)-এর ঘটনা বহুল জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর নেতৃত্ব

মক্কা জীবনে রাসূল (সাঃ) ছিলেন একজন ধর্ম প্রচারক; মদীনায় হিযরতের পর তিনি সুনিপুণ যোদ্ধা, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, আদর্শ শাসক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধিকারী হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেন। মহানবী (সাঃ) শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারকই ছিলেন না, বরং পার্থিব জীবনের নানা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করার মত যোগ্য নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তা যুক্তি সহকারে উল্লেখ করেছেন। *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* গ্রন্থে লেখক সাবলিল ভাষায় হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দূর অতীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য নবী-রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলেন। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-খন্ডে আবির্ভূত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান আল-ইসলামকে মানব সমাজে কায়েম করার আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং বিশ্ববাসীকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নেতৃত্ব দেন। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,"এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা; তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত; তাহাদিগকে ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম সৎকর্ম করিতে, সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে; তাহারা আমারই 'ইবাদত করিত।"[১]

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পুরোপরি বিকাশ ঘটে মদীনায় হিযরতের পর। বরকতুল্লাহ হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নেতৃত্ব সম্পর্কে *নবীগৃহ সংবাদ* ও *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বরকতুল্লাহ এ বিষয়ে আলোচনার প্রারম্ভেই হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর শারীরিক গঠন ও নেতৃত্ব সুলভ গুণ সম্পর্কে সুন্দরভাবে বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> তিনি অতি দীর্ঘ ছিলেন না, আবার অতি খর্বও ছিলেন না, পরন্তু মধ্যমাকৃতি সুপুরুষ ছিলেন। তেজ বীর্য ও নেতৃত্বসুলভ দৃঢ়তার ছাপ তাঁহার গঠনে ছিল সুস্পষ্ট। তাঁহার দেহ মেদবহুল ছিল না এবং উদরদেশ স্ফীত ছিল না। বাহুদ্বয় ও পদযুগল ছিল দৃঢ় গঠিত এবং সুপুষ্ট, যেন পাথরে নির্মিত। তাঁহার প্রকৃতি ছিল সুমধুর এবং ব্যবহার বিনয়নম্র। কখনও কোন রূঢ় বা অশ্লীল বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতে কেহ শুনে নাই। তাঁহার ভাষা ছিল মার্জিত এবং উচ্চারণ সুস্পষ্ট। উহাতে কোন প্রকার জড়তা বা অস্পষ্টতা থাকিত না। ইহা আরব জাতিরই একটা বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁহার বক্তব্যকে অতি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিতে ও মানুষের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিতেন। উহাতে বাহুল্য উক্তি বা বাগাড়ম্বর থাকিত না; অথচ উত্তম বিন্যাস দ্বারা কথাগুলিকে তিনি সরস ও উপভোগ্য করিতে পারিতেন। তাই তাঁহার কথা একবার শুনিলে শ্রোতাদের মনে দীর্ঘকাল উহা অঙ্কিত থাকিত।[২]

মহান সৃষ্টিকর্তা তার নবীকে এভাবে নেতৃত্বসুলভ নানা গুণে অলঙ্কৃত করে দুনিয়াতে মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর এই অসাধারণ গুণাবলীর জন্য তিনি সহজেই মদীনাবাসীদের হৃদয় জয় করে মাত্র দশ বৎসর সময়ের মধ্যে বহুদা বিভক্ত মদীনাবাসীকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি সুশৃংখল জাতি ও নূতন রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছিলেন। মদীনায় হিযরতের পর নবী (সাঃ) আনসারদের সহযোগিতায় বসতি স্থাপন করেন। আনসারগণ অনেকেই নবীকে গৃহ নির্মাণের জন্য ভূমিদানের আগ্রহ প্রকাশ করলেও তিনি বিনামূল্যে কারও সম্পত্তি গ্রহণ করেন নি। তিনি দশ দেরহাম মূল্য দিয়ে একখন্ড জমি ক্রয় করেন এবং প্রথম একটি মসজিদ তৈরী করেন। ক্রয়কৃত জমিতে মসজিদের স্থান সঙ্কুলানের পর অতিরিক্ত জায়গা না থাকায় তিনি পৃথকভাবে আবাস গৃহ নির্মাণ করতে পারেন নি। মসজিদের পূর্ব দেওয়াল সংলগ্ন খেজুর পাতা দিয়ে কয়েকটি হুয্‌রা নির্মাণ করেন। এর একটিতে তিনি নিজে ও অন্যগুলিতে তাঁর পরিবারবর্গ থাকতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) সহ প্রধান প্রধান সাহাবীগণ পৃথক জমি ক্রয় করে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। মোহাজিরগণের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র তারা সাময়িকভাবে মদীনাবাসীদের গৃহে বসবাস করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মক্কা থেকে মদীনায় আগমনকালে রাসূল (সাঃ)-কে অনেক সম্ভ্রান্ত আনসার তাদের গৃহে যাওয়ার আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু নবী (সাঃ) একজনের অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যদের অসন্তুষ্ট করেন নি। তিনি তাঁর আত্মীয় আইয়ূবের আমন্ত্রণক্রমে তাঁরই গৃহে আশ্রয় নিলেন।[৩]

হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর আগমণের পূর্বেই প্রায় দুইশত মোহাজির মদীনায় পৌঁছে। নবী তাদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সর্বদা উৎসাহিত করতেন। নবীর সংস্পর্শে এসে দরিদ্র মোহাজিরগণও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। সেই সাথে তারা উদার চরিত্রের গুণাবলীও অর্জন করে। মোহাজিরগণের অবস্থার উন্নতি হলে তারা আশ্রয়দাতার সম্পত্তি বা দান কৃতজ্ঞতার সাথে ফিরিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে বরকতুল্লাহ বলেন, "আরবজাতি আল্ কিমিয়ার চর্চা করিয়া তাম্রকে সোনায় পরিণত করিতে পারে নাই কিন্তু আরব নবী মুহম্মদ (সাঃ) মানুষের কালো অন্তরকে সফেদ ও জ্যোতির্ময় করিয়া ফিরিশতার পর্যায়ে উন্নীত করিতে পারিয়াছিলেন।"[৪]

ক্রমান্বয়ে মদীনার সাবেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও নবীর প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তারা অমুসলিম সত্ত্বেও নবীর দরবারে যাতায়াত করতেন। এদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাসূল (সাঃ)-এর সংশ্রবে এসে তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এভাবে দিনে দিনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। নবী প্রবর্তিত মদীনার সমাজ ব্যবস্থা নানাদিক দিয়া ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই নবীর এ শিক্ষা যেমন মুসলমানেরা গ্রহণ করে, তেমনি অমুসলিমগণকেও তারা শত্রু মনে করে নাই। সকল ধর্মের অনুসারীরা স্বাধীনভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করবে এই শিক্ষা নবীর কাছ থেকে তারা পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তিনি পারস্পরিক কলহ ও মদীনা নগরের শান্তি-শৃংখলা যাতে বিনষ্ট না হয় পৌত্তলিক ও ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের সাথে যে রফা করেন তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। নবী সকলকে নিয়ে একটি ব্যবস্থাপকমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব করেন যাতে পারস্পরিক কোন বিরোধ বাধলে সহজেই এর মীমাংসা হতে পারে। ইয়াহুদী ও পৌত্তলিক নেতাগণ নবীর এই প্রস্তাব উত্তম বিবেচনা করে

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাঁরা মদীনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে একটি প্রস্তাব পাশ করেন এবং এর প্রেক্ষিতে সকলে মিলে একটি অঙ্গীকার পত্র প্রণয়ন ও স্বাক্ষর করেন। অঙ্গীকার পত্রের উল্লেখযোগ্য দুটো ধারা তুলে ধরা হল-

১. কোনও শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করলে শহরের তিন সম্প্রদায়ের লোকই সমবেতভাবে ইহার প্রতিরোধকল্পে অগ্রসর হবে; এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় ইহার নিজ রক্ষী-বাহিনীর ব্যয়বার বহন করবে।

২. মদীনার কোনও এক সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে শত্রুপক্ষের সাথে, বিশেষ করে মক্কার কুরায়েশদের সাথে, কোনও রূপ সন্ধিশর্তে আবদ্ধ হতে পারবে না বা নগরের কোন গোপন তথ্য তাদেরকে সরবরাহ করতে পারবে না।

এই অঙ্গীকার পত্র সম্পর্কে বরকতুল্লাহ বলেন, "এই বৈঠকে নবীর যে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ পায় তাহা অপর দুই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে চমৎকৃত করে এবং অজ্ঞাতসারেই তাহারা তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দান করে।"[৫]

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে মহানবী (সাঃ)-এর দূরদর্শিতায় মুসলমান সমাজ মদীনা'য় প্রভাবশালী সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মদীনায় তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপদকালে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেও মুসলমানদের আত্মরক্ষার উপযুক্ত সামর্থ্য ছিল না বললেই চলে। বিশেষত মুসলমানেরা মক্কায় অবস্থানকালে অহিংস নীতিরই পরিচয় দেয়। মক্কায় মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন এমনকি মুহম্মদ (সাঃ)-কে তায়েফের প্রান্তরে কঙ্কর নিক্ষেপে তাঁর পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে। তারপরও তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন, "ইয়া রাব্বুল আ'লামীন, এরা অজ্ঞান, এরা জানে না এদের মঙ্গল কিসে? তুমি ক্ষমা করিও, জ্ঞানদান করিও।"[৬]

Dhaka University Institutional Repository

এই ছিল মহানবী (সাঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই সংঘাতময় পৃথিবীতে টিকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। মক্কা ত্যাগের পূর্বেই রাসূল (সাঃ) এ সত্য উপলব্ধি করেন। এ সম্পর্কে বরকতুল্লাহ বলেন,

> নবীর মদীনায় প্রস্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময়ই যুদ্ধের চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে এবং আকাবার নিভৃত গিরি-কন্দরে তিনি যখন মদীনার নেতৃবর্গের সহিত সহ-অবস্থানের শর্ত্তসমূহ আলোচনা ও স্থিরীকৃত করিতেছেন, তখন মদীনার মুসলমানদের উপর তাহাদের আশ্রিত নবীর জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে অস্ত্র ধারণ করারও একটী শর্ত আরোপিত করিতেছেন।[৭]

মহানবী (সাঃ) মদীনায় পৌঁছে অহিংসবাদী মুসলমানদের পবিত্র আয়াতে কারীমা দ্বারা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাদান করেন-

> "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম;"[৮]

> "তাহাদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।' আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খৃস্টান, সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ-যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাহাকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"[৯]

Dhaka University Institutional Repository

হিযরতের পূর্বে মুসলমানদের অতীত ইতিহাস ছিল অত্যন্ত করুণ ও বেদনাময়। তার উপর মদীনায় আসার পর হতে পবিত্র হজ্জ্ব পালনের ক্ষেত্রেও তারা বাধার সম্মুখীন হন। এছাড়া কাফের মুশরিকদের নানাবিধ শত্রুতাবাপন্ন মনোভাব মুসলমানদিগকে অস্ত্রধারণে বাধ্য করে। এমন প্রেক্ষাপটে ওহির ভাষা জ্বালাময়ী হয়ে সরাসরি জিহাদ ও যুদ্ধের নির্দেশ প্রদান করে। পবিত্র কুরআনের সূরা মুহম্মদ-এ জিহাদ ও যুদ্ধের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতে কারীমায় এই বজ্রবাণী ধ্বনিয়া উঠে-

> অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সহিত যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে ইহাই বিধান। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চাহেন তাহাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে যাহারা আল্লাহত্ম পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদের কর্ম বিনষ্ট হইতে দেন না।[১০]

> "যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমা লংঘন কনিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীগণকে ভালবাসেন না।"[১১]

> "যেখানে তাহাদিগকে পাইবে হত্যা করিবে এবং যে স্থান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছে তোমরাও সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিবে। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিও না যে পর্যন্ত তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে। যদি তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে, ইহাই কাফিরদের পরিণাম।"[১২]

> "যদি তাহারা বিরত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

"আর তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তাহারা বিরত হয় তবে যালিমদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও আক্রমণ করা চলিবে না।"[১৪]

এ সকল আয়াতের আলোকে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সরাসরি নেতৃত্ব দেন। হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নেতৃত্বের গুণাবলীর মধ্যে তাঁর সাহসিকতা, যুদ্ধক্ষেত্রে নৈপূণ্য প্রদর্শন, যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

পবিত্র কোরআনের এ সকল নির্দেশ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অত্যাচারী যালিমকে পর্যূদস্ত করা, আর্ত ও বিপন্নকে সাহায্য করা, আল্লাহর ঘরসমূহের মর্যাদা রক্ষা করা এ সকল দায়িত্ব মুসলমানদের উপর অর্পিত হয়েছে। বরকতুল্লাহর মতে শুধু ঘরে বসে স্তব স্তুতির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। এ সকল দায়িত্ব পালন করতে মুসলমানদিগকে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর নেতৃত্বে মদীনার মুসলিম জাতি একটি যুদ্ধ-নির্ভীক সামরিক জাতিতে সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। এতে মহানবী (সাঃ)-এর অসাধারণ নেতৃত্ব শক্তির পরিচয় ফুটে উঠে।

ইয়াতিমের প্রতি সুবিচার, নারীর যথাযথ মর্যাদা প্রদান, উত্তরাধিকার আইন, দণ্ডবিধি, সামাজিক শিষ্টাচার ও সভ্যতায় হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনায় বরকতুল্লাহ রাসূল (সাঃ)-এর যেসব গুণাবলী উল্লেখ করেছেন তাতে লেখকের ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও নবী প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠে।

ওহোদ যুদ্ধে অনেক মুসলমান শাহাদাৎ বরণ করায় তাদের বিধবা পত্নী ও নাবালক সন্তানদের ভরণ-পোষণ এবং বিষয় সম্পত্তি তদারকি নিয়ে মহানবী (সাঃ) যখন প্রশ্নের সম্মুখীন তখন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন,

Dhaka University Institutional Repository

> ইয়াতীমদিগকে যাচাই করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহযোগ্য হয়; এবং তাহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখিলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে। তাহারা বড় হইয়া যাইবে বলিয়া অপচয় করিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাহাদিগকে তাহাদের সম্পদ সমর্পণ করিবে তখন সাক্ষী রাখিও। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।[১৫]

এ আয়াতের আলোকে নবী (সাঃ) ইয়াতিমের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নজীর স্থাপন করেন।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীরা ছিল ভোগ্য পণ্য স্বরূপ। তৎকালীন সময়ে নারীদের কোন সামাজিক বা পারিবারিক মর্যাদা ছিল না। মহানবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থায় নারীদের অধিকার যেভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন সমাজ ব্যবস্থায় তার তুলনা হয় না। নারী স্বাধীনতার বিনিময়ে স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করবে, এর জন্য প্রাচীনকাল হতেই আরবে সামান্য মোহরানার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মুহম্মদ (সাঃ)-এর জন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে ব্যবিলনের বিখ্যাত সম্রাট হাম্মুরাবী কর্তৃক প্রণীত আইন গ্রন্থে বিবাহের শর্ত হিসেবে মোহরানা প্রদানের বিধান ছিল। সে সময়ে মোহরানাকে নারীদেহের মূল্য মনে করা হত। মোহরানাকে ইসলাম নারীর স্বামীগৃহে আগমনের সম্মানী বা নযরানারূপে গণ্য করে নারীকে মর্যাদা প্রদান করে। মূলত মোহরানা নারীকে বিত্তশালিনী করে 'ব্যক্তিত্ব' দান করে। এ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, "আর তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মাহ্ত্ম স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে; সন্তুষ্ট চিত্তে তাহারা মাহ্রের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে।"[১৬] এভাবে ওহীর আদেশকে কেন্দ্র করে নবী (সাঃ) নারীকে তার উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করেন।

সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে উত্তরাধিকারীদের ভিতর বিবাদ-সংঘর্ষ ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। নবী এক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের তাগিদ অনুভব করলেন। তিনি নিম্নোক্ত ওহীকে

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি করে সে নীতি প্রণয়ন করেন, "পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করিয়াছি এবং যাহাদের সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা।"[১৭]

এ সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে, "পিতা মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হউক অথবা বেশীই হউক, এক নির্ধারিত অংশ।"[১৮]

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে শুধু কন্যা সন্তান নয় নাবালক পুত্র সন্তানও পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ হতে বঞ্চিত হত। কারণ, তারা যুদ্ধক্ষম ছিল না। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধের মাধ্যমেই অনেক কিছু নির্ধারিত হত। সমাজে অস্তিত্ব নির্ভর করত যুদ্ধ ক্ষেত্রে পারদর্শিতার উপর। বরকতুল্লাহর মতে আরবে সেই মুহূর্তে কন্যাসন্তানদের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করা যে কত বড় বৈপ্লবিক সংস্কার তা বর্তমান সময়ে কল্পনা করাও কঠিন। এই নীতির ফলে নারীর যে ব্যক্তিত্ব পরোক্ষভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর অন্য কোন জাতি নারীর প্রতি এ ধরনের মর্যাদা প্রদর্শন করতে পারে নাই। এই আইন মুসলিম নারীকে শুধু বিত্তশালিনী ও স্বাবলম্বিনী করে নাই বরং দান বিক্রয়ের অধিকার প্রদান করে তাহাকে আত্মসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করেছে এবং নারীও সমাজের একটি শক্তিশালী অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে কে কত অংশ পাবে তাও 'সূরা নেছায়' বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তাহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়ত করার বিধান তোমাদিগকে দেওয়া হইল। ইহা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য।"[১৯]

পবিত্র কোরআনের আলোকে নবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বে যেভাবে উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে সমাজে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয় তার দৃষ্টান্ত মুহম্মদ বরকতুল্লাহ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে লেখক নবী (সাঃ)-এর সকল নেতৃত্বের গুণাবলী ও মানবীয় দিকগুলো কোরআন ও হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করেছেন।

কারবালার যুদ্ধ

মানুষের ধর্ম্ম (১৯৩৪) গ্রন্থ প্রকাশের পর বরকতুল্লাহর সাহিত্য রচনায় অনেকখানি ভাটা পড়ে এসেছিল। প্রায় তেইশ বছর তিনি নতুন কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেন নি। এ সময়ে তিনি তাঁর পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের একাধিক নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। তবে নতুন কোন সৃষ্টি কর্মে হাত দেওয়ার প্রমাণ মেলেনা। দীর্ঘ দিন তিনি এক প্রকার সাহিত্যিক নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করেন। পরিশেষে ১৯৫৭ সালে তাঁর কারবালা গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্য সাধনায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। কর্ম জীবনের ব্যস্ততায় তাঁর সাহিত্য সাধনায় অনেকখানি ব্যঘাত ঘটেছিল সত্য কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁর মানস ধর্মেও একটি পরিবর্তন এসেছিল বলে মনে হয়। তাই দেখা যায় সাহিত্য ও দর্শনের নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে সরে এসে তিনি ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। এ ব্যাপারে সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন,

> ইসলামের ইতিহাসের পাতায় জাতীয় জীবন মহিমার স্বরূপ অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হলেন, অপরদিকে নবলব্ধ জাতীয় চেতনা বশে সাহিত্যকে জনরুচির সমর্থন পুষ্ট করে তোলার তাগিদে পূর্বানুসৃত ভাষারীতির সংস্কারে প্রবৃত্ত হলেন। এর ফলে তাঁর শিল্পী সত্তা স্বভাব ধর্ম বিচ্যুত হল, তাঁর স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে সংকুচিত হল আর ভাষাকে তার দায় পোহাতে গিয়ে অনেকটাই শিল্পশ্রী বর্জিত হতে হল।[২০]

বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় *কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত* রচনার মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের ভাষ্যকার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থটির নাম ছিল শুধু *কারবালা*। কিন্তু এতে গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর সঠিক চিত্র না আসায় উক্ত নামের সঙ্গে বন্ধনীতে *কারবালার যুদ্ধ ও নবী বংশের ইতিবৃত্ত* এই অংশটি যোগ করা হয়। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে এর আমূল পরিবর্তন করে নাম দেওয়া হয় *কারবালা ও ইমাম বংশের*

Dhaka University Institutional Repository

ইতিবৃত্ত। এরপর গ্রন্থটিতে আর কোন পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করা হয় নি।[২১] গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ৩৪ বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।

কারবালার যুদ্ধ নিঃসন্দেহে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মবিদারী ঘটনা। রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তিকালের পরে আরও অনেক মর্মবিদারী হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের ন্যায় এত দীর্ঘস্থায়ী ও এত ব্যাপক শোক, মাতম ও আহাজারী মুসলিম জাতি আর কোন হত্যাকাণ্ডের জন্য করে নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় হযরত হামযা (রাঃ)-এর শাহাদাত, তাঁর কলিজা চিবানো, বীরে মাওনায় ৭০ জন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে ৩০০ জন কোরআন হাফেজের হত্যাকাণ্ড, হযরত খুবাইর ও তার সংগীদের শাহাদাত তৎকালীন মুসলিম সমাজের বুকে শেলের মত বিধেঁছিল। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) হযরত হামযা (রাঃ)-এর শাহাদাতে নিদারুণভাবে শোকাহত হয়েছিলেন। তারপর চারজন খলিফার মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) সহ তিনজন খলিফাই শহীদ হয়েছেন মর্মান্তিকভাবে। জঙ্গেঁ জামাল ও সিফফীন যুদ্ধের ন্যায় দু'টি গৃহযুদ্ধে বহু মূল্যবান প্রাণ, বিশেষত আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভূক্ত কয়েকজন সাহাবীও শহীদ হন। এ সব হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অপূরণীয় ক্ষতি হলেও শোক ও আবেগের দিক দিয়ে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড এ সব হত্যাকাণ্ড থেকে অধিক মর্মান্তিক। এমন কি ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর বড় ভাই ইমাম হাসান (রাঃ) কেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ড নিয়েও সারা দুনিয়া জোড়া এত দীর্ঘস্থায়ী শোক ও বিলাপ হয় নি, যেমনটি ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডে হয়েছিল এবং হচ্ছে। ব্যপকতার দিক দিয়ে এ যুদ্ধ হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে এর প্রভাব ছিল সূদুর প্রসারী। যুদ্ধের পর থেকে খ্রিষ্টীয় দশম শতকে উত্তর আফ্রিকায় ইমাম বংশ কর্তৃক ফাতেমীয় সাম্রাজ্য ও খেলাফত প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত দুই শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে এ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানাভাবে ইসলামের ইতিহাসকে প্রভাবিত করে আসছে। বরকতুল্লাহ লিখেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

> হুসায়েন শোক মুসলিম জাহানে যে অন্তর্দাহের সৃষ্টি করে উহারও বিস্ফোরণ শুধু মদীনা, মক্কা ও কুফায় চরম বিপর্যয় আনে নাই, পরন্তু পরবর্তী দুইশত বৎসর ধরিয়া উহার অনির্বাণ ধুম্রশিখা ইতিহাসের পাতাকে বিবর্ণ করিয়াছে এবং বহু রাজ্যের উত্থান-পতনের মূলে ক্রিয়া করিয়াছে। এই প্রকার ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সমাপ্তি ঘটে খৃষ্টীয় দশম শতকে, হুসায়েন বংশীয় ইমাম ওবায়দুল্লাহ্ আল মেহ্দী কর্তৃক মিশরে ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায়।[২২]

কারবালার যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ক্ষমতা লিপ্সা ও ক্ষমতা দ্বন্দ্বই এ যুদ্ধের মূল কারণ। কিন্তু ঘটনাটি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে ভক্ত মুসলমান নানা ধরনের অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক কাহিনীর উদ্ভাবন করেছে ও তার গ্রন্থরূপ দিয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত জঙ্গনামা, শহীদে কারবালা, বিষাদ সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে এ ধরনের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লেখার সময় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা ঐতিহাসিকদের কর্তব্য। পরিপূর্ণ সততা ও ইনসাফের সাথে প্রত্যেক ঘটনার প্রতিটা খুঁটিনাটি বিবরণ তুলে ধরতে হয়। কিন্তু এমন নিরপেক্ষতা বাস্তবে খুব কমই দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণ যখন ইতিহাস লিখতে বসেন, তখন সংঘটিত ঘটনাবলীকে নিজের ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার আলোকেই দেখে থাকেন এবং সেই অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এক পক্ষকে নিষ্পাপ এবং অপর পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে থাকেন। এমনকি এ কথা বলাও অত্যুক্ত হবে না যে, অনেক ঐতিহাসিক ইতিহাস লেখার সিদ্ধান্তই নেন একটা আদর্শ বা চিন্তাধারাকে ঘটনাবলীর আলোকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ও ইনসাফপ্রিয় ইতিহাসবিদদের কর্মপন্থা এমন হওয়া উচিত নয়। বড়জোর সংঘটিত ঘটনাবলীকে বিভিন্ন শ্রেণী যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে, তার উল্লেখ করতে পারেন এবং নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি তুলে ধরতে পারেন। এতেও কিছুটা নিরপেক্ষতা বজায় থাকা সম্ভব। কারবালার কাহিনী এমনিতেই শোকাবহ ও মর্মস্পশী। দীর্ঘ তেরশত বৎসর যাবৎ কবি সাহিত্যিকেরা নানা কাল্পনিক গল্পের অবতারণা করে মূল কাহিনীকে আরও বেশী আকর্ষণীয় ও হৃদয়বিদারক করার চেষ্টা চালিয়েছেন। কারবালা যুদ্ধের মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক ও বংশ বিদ্বেষ। সেখানে কোন কোন গ্রন্থে নারী ঘটিত প্রণয় কাহিনীকে মুখ্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা

Dhaka University Institutional Repository

যেতে পারে আব্দুল জব্বার ও তার পত্নী জয়নাবের ঘটনাবলী। এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মুহম্মদ হানাফিয়ার যুদ্ধে গমন ও এজিদের পশ্চদ্ধাবন ইত্যাদি ঘটনার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বস্তুত হানাফিয়া যুদ্ধে যান নাই এবং মুহম্মদ হানাফিয়া বা হানিফা কর্তৃক আক্রান্ত হন নাই। ইয়াযিদ শিকারে গিয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুসলিম বিন আকিলকে কুফায় পাঠানো হয়েছিল গোপনীয় দৌত্য কাজে ইমাম হোসেনের কুফা গমনের পূর্বে। সুতরাং মুসলিমের দুইটি নাবালক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক। অথচ তাঁর দুই সুকুমার পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যার এক করুণ চিত্র দেখানো হয়েছে কারবালার কাহিনীতে। মূলত এ ধরনের কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে পাঠকদের চক্ষুতে অশ্রু আনয়নের জন্য। এসব অমূলক কিচ্ছা কাহিনী প্রকৃত ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বরকতুল্লাহ চেয়েছিলেন মূল ইতিহাস হতে মালমসলা সংগ্রহ করে কারবালার আসল ইতিহাসকে উদ্ধার করতে। এ জন্য ঐতিহাসিক বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করার জন্য বরকতুল্লাহকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখানে বরকতুল্লাহকে আমরা একজন তথ্য ও সত্যনিষ্ট ইতিহাস লেখক হিসেবে দেখতে পাই। তবে তিনি যে মূলত একজন সাহিত্যিক ছিলেন সে পরিচয়টিও গ্রন্থের অনেকাংশে দেখতে পাওয়া যায়।

ইতিহাসের অন্তরালে রয়েছে আরও ইতিহাস। কোন ঐতিহাসিক ঘটনাই স্বয়ং স্বতন্ত্র নয়। হিজরী ৬১ সালের মহররম মাসে (৬৮০ খ্রিঃ) কারবালা প্রান্তরে যে মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তার সূত্রপাত হয়েছিল বহুপূর্বে। কুরাইশ বংশের দুই গোত্র উমাইয়া-হাশিমীদের সামাজিক সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। বরকতুল্লাহ গ্রন্থের প্রারম্ভেই এসকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কারবালা যুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করেন। এই পটভূমি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা না থাকলে কারবালার যুদ্ধ ও পরবর্তী মুসলিম ইতিহাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নেওয়া সম্ভব হবে না। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য শহরের মধ্যে মক্কার পরেই মদীনা, কুফা ও দামেস্ক অন্যতম। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সাথে এ তিনটি শহর বিশেষভাবে জড়িত। উক্ত তিনটি শহরের অবস্থানগত বর্ণনার পর বরকতুল্লাহ বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> হযরত আলীর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ইসলামী ত্যাগ ও সাত্ত্বিকতার যে 'মৌলিক' আদর্শ অকালে মুষড়িয়া পড়ে, বিশ বৎসর পরে নবীর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হুসাইনের ভিতর দিয়া সেই আদর্শ চাহিয়াছিল পুনরায় পূর্ণজ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ। কারবালার যুদ্ধ এবং হুসাইনের আত্মদান, ভোগ বিলাসের আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে সেই সাত্ত্বিক আদর্শের সংঘাতের মর্মান্তিক পরিণতি। হুসাইন সে সংঘর্ষে জয়ী হইতে পারেন নাই, শহীদ হইয়াছিলেন। কিন্তু শহীদী খুনে তিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত করিয়া যান। বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত যাহা করিতে পারিতেননা, জীবনের বিনিময়ে তিনি তাহা সম্পন্ন করিয়া গেলেন। তিনি মরণজয়ী মহাপুরুষ। তাঁহার আত্মত্যাগের অপূর্ব কাহিনী যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্বের কাব্যে, ইতিহাসে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে গীত হইবে এবং তাঁহার স্বজাতিকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে থাকিবে। 'হর কারবালা মুসলিম জাতিকে নূতন করিয়া যিন্দা করিবে।[২৩]

কুরাইশদের পূর্ব পুরুষ বিখ্যাত ফিরহ কুরেশ আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় বসতি স্থাপন করেন। কুরেশ শব্দের অর্থ সওদাগর। এ থেকে বুঝা যায় তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। ফিরহ কুরেশ ছিলেন অসীম সাহসী, সৌম্য দর্শন ও বুদ্ধিমান। নিজের যোগ্যতায় অল্প কালের মধ্যেই তিনি মক্কাবাসীদের চিত্ত জয় করেন ও তাদের উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেন। ফিরহ কুরেশের সন্তান-সন্ততি কালক্রমে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মক্কা ও তার চতুপার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তারা সকলেই কুরাইশ নামে পরিচিতি লাভ করে। কুরাইশ ছাড়া আরও কিছু বংশ পূর্ব হতে মক্কায় বসবাস করত। যে কাবা গৃহের জন্য মক্কা সমগ্র আরবে তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল, নিজেদের যোগ্যতার দ্বারা সেই কাবার রক্ষক ও সেবাইত হয়েছিল কুরাইশগণ। এ জন্য মক্কায় কুরাইশদের মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। ফিরহ কুরেশের বংশের ষষ্ঠ পুরুষ বিখ্যাত কুশাই কুরেশ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে মক্কার পৌরসভাপতির আসন লাভ করেন এবং নগরের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভূষিত হয়ে বিশেষ গৌরব অর্জন করেন। ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদু-দ্দার সকল ক্ষমতার অধিকারী হন। তবে আবদু-দ্দার এর চেয়ে তাঁর ছোট ভাই আবদু মানাফ ছিলেন অধিকতর কর্ম কুশল ও প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তি। আবদু-দ্দার এর মৃত্যুর পর সকল ক্ষমতা আবদু-মানাফের হাতে চলে আসে। আবদু-দ্দারের

Dhaka University Institutional Repository

পুত্রগণ সে সময়ে ছিল অল্প বয়স্ক। আবদু-মানাফের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের সাথে আবদু-দ্দারের পুত্রদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আবদু-দ্দারের পুত্ররা তাদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে। বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশালী মানাফ পুত্রগণই মক্কার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখে। এভাবে কুশাই-এর বংশে দু'টি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী শাখার উদ্ভব হয় এবং বিশাল কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য শাখাগুলি পক্ষে বিপক্ষে যোগদান করে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সূচনা করে। কিন্তু মক্কার কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মীমাংসার উদ্যোগের ফলে সংঘর্ষ বাধে নাই। মীমাংসায় নির্ধারিত হয়, মক্কায় আগত তীর্থ যাত্রীদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করবে মানাফ পুত্র হাশিম। অপরদিকে, পৌর শাসন, যুদ্ধ চালনা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয় আবদু-দ্দারের বংশের উপর। কাবা তীর্থের প্রধান আয়ের অধিকারী হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই হাশিম যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। তাঁর আচরণও ছিল রাজোচিত। পক্ষান্তরে আবদু-দ্দারের বংশ শাসন সংক্রান্ত নানা ক্ষমতার অধিকারী হয়েও জনসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে হাশিমীদের উপর তাদের ঈর্ষা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। পরে উমাইয়ার কারণে মানাফ গোষ্ঠীতেও ফাটল ধরে। উমাইয়া ছিলেন মানাফের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদু শামস-এর ছেলে। উমাইয়া ছিলেন উদ্ধত ও দাম্ভিক প্রকৃতির। মানাফের দ্বিতীয় পুত্র হাশিমের প্রতি তার যথেষ্ট হিংসা-বিদ্বেষ ছিল। কারণ পিতৃব্য হাশিম পিতা শামস-এর তুলনায় অধিক প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। যা তিনি সহজে মেনে নিতে পারেন নি। হাশিম রোমের শাসনকর্তার সাথে সন্ধি স্থাপন করে সম্রাটের নিকট হতে এক ফরমান আদায় করেন। যার ফলে কুরাইশ বণিকগণ সিরিয়ায় নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করে। আবদু মানাফের অপর পুত্র আবদু শামস সম্রাট নাজ্জাসীর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ফলে কুরাইশরা আবিসিনিয়ায় বাণিজ্য লাভের সুযোগ পায়। মানাফের অপর দুই পুত্র নওফল ও আল্ মুত্তালিব পারস্য সম্রাটের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে ইরাক ও পারস্য প্রদেশে মক্কাবাসীদের বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করে। কিন্তু হাশিমের প্রতিপত্তি উমাইয়াকে পীড়া দিত। উমাইয়া সর্বদাই পিতৃব্য হাশিমকে হেয় করার চেষ্টা করত। হাশিমের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তিনি এক প্রকাশ্য সভা আহবান করেন। তৎকালীন আরবে এরূপ সভা আহ্বানের রীতি প্রচলিত ছিল। এ ধরনের সভায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের গুণ বিচার হত। হাশিম আপন ভ্রাতুস্পুত্রের সঙ্গে এরূপ প্রতিযোগিতায়

Dhaka University Institutional Repository

অবতীর্ণ হওয়া সঙ্গত মনে না করলেও গোত্রপতিদের প্ররোচনায় তিনি নীরব থাকতে পারেন নাই। হাশিম শর্ত দিলেন যে, প্রতিযোগিতায় যে পরাজিত হবে তাকে বিজয়ীকে পঞ্চাশটি কৃষ্ণ-চক্ষু উট দিতে হবে ও দশ বছরের জন্য মক্কা থেকে নির্বাসনে যেতে হবে। দাম্ভিক উমাইয়া এই শর্ত মেনেই সভায় উপস্থিত হন। তারা উভয়েই নিজ নিজ কীর্তিকলাপ ব্যক্ত করেন। অতঃপর সভা হাশিমকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে। পূর্ব শর্ত মোতাবেক উমাইয়া দশ বৎসরের জন্য সিরিয়া চলে যান। তার প্রদত্ত পঞ্চাশটি উটের মাংস দ্বারা হাশিম মক্কাবাসীদিগকে বিরাট ভোজে পরিতুষ্ট করেন। এতে উমাইয়ার ক্রোধের জ্বালা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নির্বাসনের ফলে সিরিয়ার সঙ্গে উমাইয়ার বংশের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, যা পরবর্তী ইতিহাসকে প্রভাবিত করে।

উমাইয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র হারের উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য হাশিমপুত্র আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। আবদুল মুত্তালিব পিতার মতই সদগুণের অধিকারী ছিলেন। মক্কায় তাঁর যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা ছিল। পিতার ন্যায় মুত্তালিবও রাজোচিত উদারতা ও সমারোহের সহিত মক্কায় তীর্থকারীদিগের সহযোগিতা করেন। মদীনার শক্তিশালী খাজরাজ বংশ ছিল তার মায়ের বংশ। মক্কার প্রসিদ্ধ খোজা বংশের সাথেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। অন্যান্য কুরাইশগণও তাঁর উচ্চ মানসিকতার দরুণ যথেষ্ট সম্মান করত। এ সকল কারণে বৈদেশিকগণ তাঁকে মক্কার 'মুকুটহীন রাজা' বলত। কিন্তু এক পর্যায়ে তাঁকেও হারেবের সঙ্গে মর্যাদার প্রতিযোগিতায় প্রকাশ্য সভায় অবতীর্ণ হতে হয়। এতে মুত্তালিব শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন। এরপর হারেব মুত্তালিবের গোত্রের সংস্রব ত্যাগ করে। এভাবে জ্ঞাতি-বিদ্বেষের বিষাক্ত ধারা বংশানুক্রমে উমাইয়াদের সন্তান-সন্ততির মাঝে সংক্রমিত হয়। আবদু মানাফের বংশ এভাবে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর প্রধানতম শত্রু বিখ্যাত কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ছিলেন হারেবের পুত্র। আবু সুফিয়ানের পুত্র আমীর মুয়াবিয়া আর মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ বদর ও ওহোদের যুদ্ধের সময় উমাইয়া বংশ এবং আবদু-দ্দারের বংশ একযোগে রাসূল (সাঃ), হযরত আলী (রাঃ), আমীর হামযা (রাঃ) প্রমুখ হাশেমী বংশীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। বদর যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর পতাকাধারী ছিলেন আবদু-দ্দার বংশের বিখ্যাত যোদ্ধা তালহা। যুদ্ধে নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উমাইয়ার পৌত্র আবু সুফিয়ান। অপর পক্ষে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন এগার পুত্রের জনক। তাঁর পুত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুতালেব, আমীর হামযা, আব্বাস ও আবদুল্লাহ (রাঃ) প্রমুখ। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এ নামগুলি মুসলিম জাহানে সুপরিচিত। হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পিতা ছিলেন আবদুল্লাহ। হামযা ছিলেন বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। বাগদাদের খলিফা হারুণ-অর-রশিদসহ আব্বাসীয় খলিফাদের পূর্বপুরুষ হলেন আব্বাস।

শান্তি-শৃংখলা ও উদারতা ছিল হাশেমী বংশের বৈশিষ্ট্য। অন্যপক্ষে উমাইয়ারা ছিল ক্ষাত্র ভাবাপন্ন ও কুটনীতিতে বিচক্ষণ। আবু সুফিয়ানের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে উমাইয়া বংশ পরবর্তীকালে অতিশয় ক্ষমতাবান ও ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনার নেতৃত্ব ছিল তাদের হাতে। বৈদেশিক বাণিজ্যেও তারা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। এদিক থেকে তারা হাশিমীদের ছাড়িয়ে যায়।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী পর্যালোচনায় দেখা যায় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস হযরত (সাঃ)-এর নব্যুয়ত প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ানের সাথে বাক্যালাপ করেন। মুহম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর আবু সুফিয়ানের পুত্র মুয়াবিয়া (রাঃ) নিজ যোগ্যতা বলে সিরিয়ার ন্যায় সমৃদ্ধ দেশের শাসনভার লাভ করেন। সেই সাথে বিশাল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হয়ে উমাইয়া বংশকে সার্বভৌম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হাশিমী বংশকে উচ্ছেদ করতে সংকল্পবদ্ধ হন। এই সংকল্পেরই প্রথম প্রকাশ আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সিফফিনের যুদ্ধ এবং তার পরিণতি কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

কুরাইশদের বংশ তালিকা[২৫]

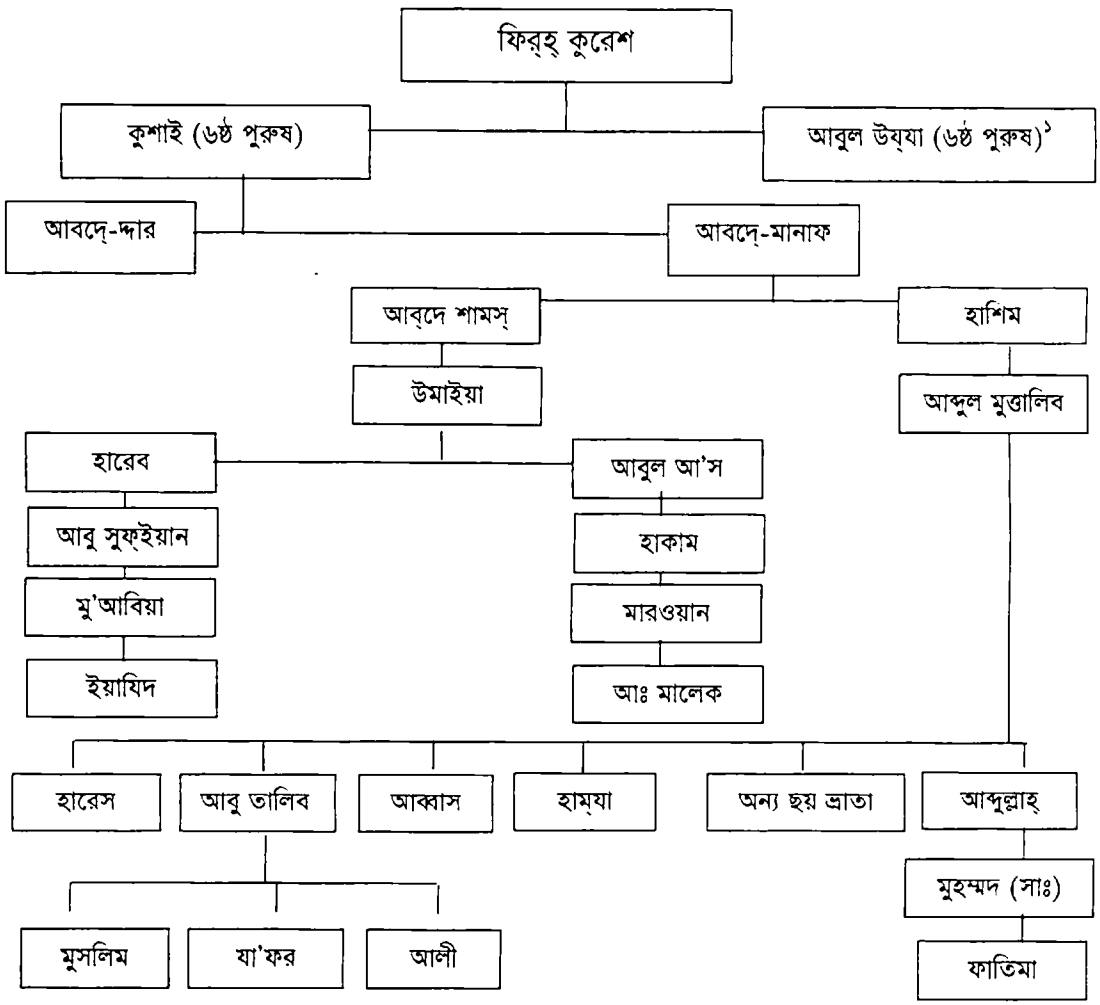

হাশিমীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই আলীর বিরুদ্ধে মুয়াবিয়ার বিদ্রোহের মূল কারণ। এ সম্পর্কে বরকতুল্লাহ লিখেছেন,

> সিফ্‌ফিন যুদ্ধের মূল কারণ তাল্‌হা ও যুবায়েরের হত্যা ছিল না। দীর্ঘ দেড়শত বৎসর ধরিয়া বনি হাশিমদের বিরুদ্ধে বনি উমাইয়াদের যে বিদ্বেষবহ্নি ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হইতেছিল এবং যাহা হযরতের সাহচর্যের অমৃত মোক্ষণে কিয়ৎকালের জন্য সাম্যভাব ধারণ করিয়াছিল, মু'আবিয়ার এই বিদ্রোহ তাহারই কেন্দ্রীভূত বিক্ষেভোর অগ্ন্যুৎগার। হাশিমী বংশকে উৎখাত করিয়া নিজ উমাইয়া বংশে খিলাফৎ আনয়ন ছিল মু'আবিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

শুধু আলী-মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব নয়, মুহম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দীকাল ইসলামের ইতিহাসে যেসব কলংকজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তার পিছনে উমাইয়াদের বংশগত বিদ্বেষমূলক মনোভাব-ই ক্রিয়াশীল ছিল। সৈয়দ আমীর আলী উমাইয়াদের চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,

> ... they had long been the rivals of the Hashimides, the family of the prophet, and hated them fiercely; they had pursued Mohammed with bitter ferocity; and it was only after fall of Mecca that they had adopted Islam from motives of self-interest. They had seen in the progress of Islam the means of personal aggrandisment. Their hatred of the simple austere companions of the prophet who ruled over Islam was burning and implacable. [২৭]

কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত গ্রন্থটি সতেরটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। তার মধ্যে চৌদ্দটি অধ্যায় জুড়ে বরকতুল্লাহ হাশিমীদের প্রতি উমাইয়াদের বংশগত বিদ্বেষ ও ক্ষমতা লিপ্সার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। কারবালার প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসেনকে হত্যা করেও উমাইয়াদের বিদ্বেষ দূরীভূত হয় নি, নিজেদের ক্ষমতাকে নিষ্কন্টক করতে তারা পরবর্তীতে আরো ইমামকে হত্যা করে একাধিক কারবালার সূত্রপাত করেন।[২৮]

কিন্তু কারবালায় ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর শাহাদাতের মাধ্যমেই ঐতিহাসিক পরিণতির সমাপ্তি ঘটে নি, আব্বাসীয় বংশের পরবর্তী পাঁচশ বছরের অধিক শাসনকাল পর্যন্ত তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিস্তৃত ছিল। বরকতুল্লাহও এই উমাইয়া শাসনের অবসানের সাথে কারবালার বিষাদময় কাহিনীর সমাপ্তি করতে পারেন নি। বরকতুল্লাহ অত্যন্ত করুণ হৃদয় নিয়ে লিখেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

> কারবালার বিষাদময় কাহিনীর এইখানে সমাপ্তি করিতে পারিলে মন্দ ছিল না, কেননা বনি উমাইয়া ও বনি-হাশিম বংশদ্বয়ের পুরুষানুক্রমিক বিবাদের এইখানে যবনিকা পতন হইয়াছে। কিন্তু ইমামবংশের দুঃখের ইতিহাস এইখানে সমাপ্ত হয় নাই। তাঁহাদের পরবর্তী দুঃখের কারণ উমাইয়া বংশ নয়। এবার আঘাত আসে এমন একটী হইতে যাহাদের পূর্বপুরুষ হযরত আব্বাস ছিলেন মহানবী ও তাঁহার সন্তানদের নিকটতম আত্মীয়, পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও বিশ্বস্ততমস্ত পৃষ্ঠপোষক। আব্বাসীয় বংশ ও আলীবংশ একই হাশেমী গোত্র হইতে উৎপন্ন দুইটি শাখা। অথচ আব্বাসীয় শাখার নৃপতিগণ আলীবংশের উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা উমাইয়াদের দুর্ব্যবহারের চাইতে অধিক মর্মান্তিক।[২৯]

আব্বাসীয়রাও উমাইয়াদের মতো নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য ইমামদের প্রতি নিপীড়নসুলভ মনোভাব ব্যক্ত করে। খলিফা আল মনসুর, হারুন-অর-রশীদ ও মুতা ওয়াক্কিল বিভিন্ন ইমাম ও তাদের আত্মীয়বর্গের উপর যথেষ্ট অবিচার ও অত্যাচার করে। খলিফা মুতা ওয়াক্কিলসহ কতিপয় শাসকগণ তো নযফে হযরত আলীর ও কারবালায় ইমাম হোসেনের মাযার পর্যন্ত ধুলিসাৎ করে দেয়।[৩০]

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁর আবেগঘন ভাষায় খলিফা মনসুরের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিবরণে উল্লেখ করেন,

> তাঁহার প্রথম আক্রোশ নিপতিত হইল মদীনা ও বসরার উপর। বসরার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা ইব্রাহীমকে সহায়তা করার অপরাধে ধৃত ও প্রাণদন্ডে দণ্ডিত হইল। তাঁহাদের বাড়ীঘর ধূলিসাৎ করা হইল, ফলের বাগানসমূহ কাটিয়া নিশ্চিহ্ন করা হইল এবং ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। মদীনার বনি-হাসানদের এবং সেই সঙ্গে বনি-হুসায়েনদেরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। নবীর শহর বলিয়া মদীনা এতদিন যে সকল বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছিল সে সমস্তও বিলুপ্ত করা হইল। হুসায়েন বংশীয় ইমাম যাফর আস্ সাদিক কোনও দিনই কোনও রাজনৈতিক সংস্রবে থাকিতেন না। তাঁহার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হইল। তিনি নিজের

Dhaka University Institutional Repository

> নির্দোষিতা দেখাইয়া তাঁহার সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি হইতে রেহাই প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে প্রাণদন্ডের ভয় দেখান হইয়াছিল। ইমাম আবু হানিফাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। ইমাম আব্দুল মালিককে কঠিন বেত্রদন্ডে দন্ডিত করা হইল।[৩১]

মনসুরের এই অবিচার-নির্যাতনের পর ইমাম বংশ মদীনায় আর মাথা তুলতে পারে নাই। অবশ্য দীর্ঘকাল পর ফাতিমা-বংশীয় বীর সন্তানেরা মিশরে সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে খলিফা আল-মামুন উপলব্ধি করেন যে, হযরত আলীর বংশই মুসলিম জাহানের খেলাফতের প্রকৃত অধিকারী। এই উপলব্ধি থেকে তিনি আলী বংশীয়দের হাতে অর্থাৎ তদানীন্তন ইমাম তৃতীয় আলী ইবনে মুসাকে ক্ষমতা দিতে মনস্থ করেন এবং সে মর্মে কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। ইমাম আলী কখনও সিংহাসনের প্রত্যাশী ছিলেন না। তিনি খলিফার ফরমান শুনে বিস্মিত হলেন এবং খলিফাকে তাঁর ফরমান প্রত্যাহার করতে এবং অবিলম্বে বাগদাদে গিয়ে শাসনদণ্ড স্বহস্তে তুলে নিতে অনুরোধ জানালেন। রাজ্যের অনেক স্থানে অরাজকতা দেখা দেওয়ায় এবং তৃতীয় আলী ক্ষমতা গ্রহণে আপত্তি করায় মামুনকেই আবার শক্ত হাতে শাসনদণ্ড ধরতে হয়ে। খলিফা মামুন তাঁর উপর অতিশয় কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকে বিশ্বস্ত বন্ধু ও উপদেষ্টা রূপে গ্রহণ করেন।[৩২]

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ কারবালার যুদ্ধকে দেখেছেন আদর্শের সংঘাত হিসেবে। কারবালার যুদ্ধ এবং ইমাম হুসেনের আত্মদান, ভোগ বিলাসের আসুরিক শক্তির সঙ্গে ইসলামের সাত্বিক আদর্শের সংঘাতের মর্মান্তিক পরিণতি। তাঁর মতে এ সংঘাতে ইমাম হোসেন জয়ী হতে পারে নাই, কিন্তু ইমাম হোসেন শহীদী খুনে ইসলামকে পুনর্জীবিত করে যান। "বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত যাহা করিতে পারিতেন না, জীবনের বিনিময়ে তিনি তাহা সম্পন্ন করিয়া গেলেন।"[৩৩] ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বরকতুল্লাহর এ মন্তব্য কতখানি যুক্তি সঙ্গত তা ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

কারবালা প্রান্তরে হৃদয়বিদারক ঘটনার পর ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের যে বিস্তারিত বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে দেয়া হয়েছে তাকে ইসলামের কলঙ্কময় অধ্যায় না বলে উপায় নেই। উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় গোত্রের শাসনামলে মুসলিম রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। বাগদাদকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ও কলাকৌশল চর্চা হয়েছে কিন্তু ভোগলিপ্সা মুসলমানদের মধ্য হতে ইসলামের যে মৌলিক আদর্শ দূরীভূত হয়েছে তা ফিরে আসে নি। আরবদের বংশানুক্রমিক গোত্র কলহ, অবাধ্যতা, দূর্দমনীয়তা, বরকতুল্লাহর ভাষায়- যা হযরতের সাহচর্যের অমৃত মোক্ষণে কিয়ৎকালের জন্য শান্ত হয়েছিল তা মুহম্মদের মৃত্যুর কিছু সময়ের মধ্যেই মাথাচাড়া দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আবু বকর ও ওমরের কঠোর শাসনে তা চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর দুর্বলতার সুযোগে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যার পরিণাম হয়েছিল সুদূর প্রসারী।

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন,

> They (the Arabs) now began to chafe under koraishite predominance, and to show the seeds of sedition in distant parts, and the old racial jealousy between the Modharites and Himyarites, which had nearly died out, began to smoulder afresh, with the most disastrous consequenses to Islam.[৩৪]

"তাই হোসেনের আত্মদান ইসলামকে পুনর্জীবিত করেছিল" এ উক্তির সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্য মিলানো দুষ্কর।

কারবালার এ মর্মান্তিক ঘটনার পিছনে আরও কারণ ছিল। হাশিমীদের প্রতি উমাইয়াদের হিংসাত্মক মনোভাবের কারণ বোঝা যায় কিন্তু এই বংশের আলীর বিরুদ্ধে দুই বিশিষ্ট সাহাবী তালহা (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ)-এর বিদ্রোহের কারণ ছিল ক্ষমতালিপ্সা। তাছাড়া আলী (রাঃ)

Dhaka University Institutional Repository

এর বিপক্ষে রাসূল (সাঃ)-এর পত্নী আয়েশা (রাঃ)-এরও ভূমিকা ছিল। আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সৈন্য পরিচালনা করেছেন। আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধাচারণে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে বরকতুল্লাহ বলেন, ওসমান (রাঃ) হত্যার পর আলী (রাঃ)-এর শত্রুরা মক্কায় গিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য হযরত আলী (রাঃ)-কে দোষারোপ করেন। তালহা (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ) কে নানাভাবে প্ররোচিত করে এবং 'সরল প্রাণ' আয়েশা (রাঃ) তাঁদের দ্বারা ব্যবহৃত হন। মুসলিম সমাজে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার প্রমাণ রয়েছে। তিনি কিছু না বুঝে স্বামীর ভ্রাতা ও জামাতার বিপক্ষে কাজ করেন এমন ভাবা কঠিন। আমীর আলী বলেন, "Ayesha, the daughter of Abu Bakr, who entertained an conceivable dislike to Ali, fanned the flame."[৩৫]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করার মতো। যে মর্মান্তিক ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ড ঘটে তার প্রধান নায়ক ছিলেন মুহম্মদ বিন আবু বকর। হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যার ফলে ইসলামে যে অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হয় তা কখনও নিরসন হয় নাই। হযরত আলী (রাঃ)-এর মত ন্যায়বান শাসকও সেই অন্তর্বিপ্লব দমন করতে পারেন নাই। উহার দাহে তিনিও ভস্মীভূত হন। নবী প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্রেরও অপমৃত্যু ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ প্রভাব বিস্তার করে ইহার পরবর্তী অধ্যায়ে। বরকতুল্লাহ বলেন, "সে দিক দিয়া দেখিলে ইহা না বলিয়া পারা যায় না যে, মুহম্মদ বিন আবু বকর ইসলামের যে ক্ষতি সাধন করিয়াছেন, তেমন অন্য কেহ করে নাই।"[৩৬]

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মত বিখ্যাত সাহাবীর ঔরসে যার জন্ম এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর গৃহে যার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছে হযরত আলী (রাঃ)-এর গৃহে সেই মুহম্মদ বিন আবু বকর কি করে এমন বিপ্লবী-পন্থার অনুসারী হলেন, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। যদিও তার নিজের পক্ষে কিছু যুক্তি ছিল। মুহম্মদ বিন আবু বকরের সাথে সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা মিলিত হয়ে খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারণায় লিপ্ত হন। মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা অত্যন্ত উদ্ধত ও দুঃসাহসী ছিলেন। মুহম্মদ বিন আবু বকর ও মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফার মত দু'জন প্রতিপত্তিশালী কোরাইশ যুবক প্রকাশ্য জন সমাগমে প্রাদেশিক গভর্ণর ও খলিফার বিরুদ্ধে অপমান সূচক কথা বলে শাসকবর্গের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলেন। যা ইসলামী খিলাফতের ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে।

এ সকল ঐতিহাসিক তথ্যাবলী পর্যালোচনায় মনে হয়, কারবালা ও পরবর্তী ঘটনাসমূহের জন্য শুধু মাত্র উমাইয়া-হাশেমী গোত্রীয় কলহ দায়ী নয়। আরবদের আদিম স্বভাবও এর জন্য দায়ী যা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর প্রবল ব্যক্তিত্বের কারণে স্বল্পকালের জন্য শান্ত ছিল। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর ওফাতের পর তাদের সে আদিম স্বভাব আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যা পরবর্তী যুগে অনেক শাসকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কারবালার যুদ্ধ নামক শিরোনামে কারবালা প্রান্তরের যে মূল ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাতে ইমাম হুসেন (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডটি লেখক অত্যন্ত করুণভাবে বিবৃত করেছেন ইমামের অস্ত্রধারণ পর্বে।

ইমাম হোসেন (রাঃ) তার পত্নী শাহারবানুর নিকট হতে বিদায় নিতে গিয়ে দেখেন তাঁর দুগ্ধপায়ী শিশু আলী আসগর পিপাসায় মায়ের কুলে ছটফট করছে। ইমাম হোসেন শিশু পুত্রের এ দৃশ্য দেখে আত্মভিমান ভুলে গিয়ে শত্রু সমীপে পানি ভিক্ষা চাইলেন। কেউ উত্তর না দিয়ে এক পাষণ্ড হোসেনকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। তীক্ষ্ম তীর শিশুর বুকে বিদ্ধ হয়ে ইমামের জামা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। শোকাতুর পিতা মৃত শিশুকে স্ত্রী শাহারবানুর ক্রোড়ে দিয়ে বললেন, এই নাও, তোমার প্রাণ প্রতিম পুত্রকে 'হাওজ কাওসারের' পানি পান করিয়ে এনেছি।

Dhaka University Institutional Repository

এবার ইমাম তাঁর কন্যা, ভগিনী ও পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর হিফাজতে সোপর্দ করে বিদায় নিলেন। শিবিরের বাইরে অশ্ব আর মানুষের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি আল্লাহর নাম স্মরণ করে দুল দুলে সওয়ার হয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি প্রথমে ফোরাত নদীর দিকে অগ্রসর হলেন, পথে যাকে পেলেন তাকেই দ্বিখণ্ডিত করে ফোরাতের কিনারায় উপনীত হলেন। তৎক্ষণাৎ শিমার ওমরকে নির্দেশ দিলেন শীর্ষ তীরন্দাযদের হুকুম দাও, ত্বরায় শরসন্ধান করুক। হোসেন পানিতে নেমে অঞ্জলী মুখে তুললেন। কিন্তু পান করতে ইতস্তত বোধ করলেন। হায়! এই পানির জন্য প্রাণাধিক পুত্রগণ ও পরিবার পরিজন মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলে পড়ছে। আর তিনি সেই পানি পান করবেন। ইতোমধ্যে শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে তাঁর ওষ্ঠে বিদ্ধ হয়ে রক্তের ধারা নেমে আসল। অঞ্জলীর পানি রক্তে লাল হয়ে গেল। তিনি মুখের তীর বহুকষ্টে বের করে দু'হাত তুলে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করলেন, 'ইয়া মা'বুদ, তুই ইহার ইন্‌সাফ করিস।' এই প্রার্থনা করে ইমাম ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় দুই হাতে তলোয়ার চালাতে লাগলেন। যাকে সামনে পান তাকে হত্যা করে ঝড়ের বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। শত্রু পক্ষ সম্মুখে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেও স্রোতের পানির ন্যায় তার পশ্চাতে আবার জমায়েত হচ্ছে।

সেনাপতি ওমর সম্মুখ হতে প্রাণ ভয়ে সরে পড়লেন। ওমর শিমারকে লক্ষ্য করে বলেন শিমার জীবনে অনেক যুদ্ধ করেছ কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ বীরত্ব কখনও দেখেছ কি? ক্ষুধা, পিপাসায় কাতর, শোকে মূহ্যমান, তীরের আঘাতে শরীর জর্জরিত, তবু শেরে-ইলাহীর শের-পুত্র বিরামহীনভাবে তলোয়ার চালিয়ে যাচ্ছে। অধিক রক্ত ক্ষরণে ইমাম হোসেন (রাঃ) দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন শিমার বাছাইকৃত কয়েকজন যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়া ইমামকে ঘিরে তাঁর উপর বর্শা নিক্ষেপ করেন। আকস্মাৎ এক ব্যক্তি পিছন হতে আঘাত করে তাঁর বামহাত কেটে ফেলল। ইমাম তাৎক্ষণিকভাবে ডান হাতের তলোয়ার দিয়ে আঘাতকারীর শিরচ্ছেদ করলেন। কিন্তু অধিক রক্তপাত ও পিপাসায় ইমাম হোসেন (রাঃ) ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে অশ্ব হতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। এই সময় এক পাপিষ্ট ইমামের বক্ষস্থলে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। নিষ্ঠুর শিমার ইমামের বক্ষের উপর বসে পুনঃ পুনঃ খঞ্জর চালিয়ে তার মস্তক কেটে জগতের নিষ্ঠুরতম

Dhaka University Institutional Repository

হত্যাভিনয় সম্পন্ন করল। কিন্তু নরপিশাচদের নিষ্ঠুরতা এখানেই শেষ হয় নাই। তারা ইমামের কর্তিত শির বর্শার অগ্রভাগে ঝুলিয়ে মৃত দেহের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। আব্দুল্লাহ যিয়াদের নির্দেশে ইমামের মস্তক কুফায় প্রেরিত হল এবং মৃত দেহের বস্ত্র উন্মোচন করে কুড়িজন অশ্বারোহী সেই মৃতদেহের উপর দিয়ে নির্মমভাবে অশ্ব চালনা করল। খুরের আঘাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে মরুভূমির ধূলায় মিশে গেল।

ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর মৃত দেহের উপর নরপিশাচদের এই নিষ্ঠুরতম ও অমানুষিক কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে বরকতুল্লাহ বলেন,

> যে সুকুমার দেহ ইমামের শৈশবকালে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ অঙ্কে ধারণ করিয়া আনন্দ পাইতেন এবং পবিত্র ওষ্ঠের স্পর্শ দ্বারা যে মুখ চুম্বিত করিতেন, নির্মম কাফিরগণ নবীর সেই পরম আদরের ধনকে এই ভাবে লাঞ্ছিত করিয়া তাঁহার অস্থি-মাংস শতখন্ডে কারবালার উত্তপ্ত বালুকায় ছড়াইয়া দিল। তখন আসরের সময় উত্তীর্ণ প্রায়। ইমাম শিবিরে রমনীগণের হাহাকার ও আকুল আর্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিল। সূর্যরশ্মি বিবর্ণ হইয়া আসিল। মাতাল লু'হাওয়া দিকহারা হইয়া ধূলায় দিঙ্‌মন্ডল আচ্ছন্ন করিল। দিবসের শেষ আলো ম্লান হইয়া, লজ্জায় মুখ লুকাইতে রজনীর দ্বারে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন যাচঞা করিল।[৩৭]

১০ মহর্‌রম, ৬১ হিজরী মোতাবেক ৬৮০ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে ৫৪ বৎসর বয়সে ইমাম হোসেন (রাঃ) অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শাহাদাৎ বরণ করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিক আল্ ফাখ্‌রী লিখেছেন,

> ইহা এমন একটি শোচনীয় ঘটনা যার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে আমার মন সরে না, কেননা ইহা একটি চরম দুঃখদায়ক এবং লোমহর্ষক ব্যাপার। নিশ্চয়ই ইহা এমন একটি বেদনাকর ঘটনা যার চাইতে অধিক লজ্জাজনক আর কিছু ঘটে নাই ইসলামে। অবশ্য আলীর হত্যা ছিল ইসলামের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিপদ।

Dhaka University Institutional Repository

> কেননা, এই ঘটনার পর হইতেই এমন সব নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং লজ্জাকর রীতি অনুসৃত হইতে থাকে যার ভয়াবহতা স্মরণ করিলে সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আল্লা'র অভিসম্পাত পড়ুক সেই সব লোকের প্রত্যেকের উপর যাহাদের হাত ছিল সেই ঘটনায় অর্থাৎ যাহারা হুকুম চালাইয়াছে, এবং যাহারা ইহার সম্পাদনায় কোনও না কোনও অংশ গ্রহণ করিয়াছে।[৩৮]

কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত ইতিহাস গ্রন্থ হলেও বরকতুল্লাহ নিজের সাহিত্যিক দৃষ্টি ভঙ্গিকে সর্বক্ষেত্রে আড়াল করতে পারেন নি। ইমাম হোসেনের যুদ্ধ যাত্রার বিবরণে তার সাহিত্যিক ভাবধারার পরিচয় ফুটে ওঠে,

> দামামার সুর বাজিতেছিল। তৃষ্ণাকাতর অশ্বগুলি সে সুরে তৃষ্ণা ভুলিয়া নৃত্যের তালে পা তুলিতেছিল। অদূরে বীর সেনারা সজ্জিত হইয়া তাহাদের নেতার আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। অসি, বল্লম, ঢাল, গোর্জ, যাহার যাহা ছিল তাহা লইয়াই তাহারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইমাম তাঁহার প্রিয় অশ্ব দুলদুলে সওয়ার হইলেন। মদনে উজ্জ্বল কান্তি, মস্তকে ঈষৎ-পক্ক লম্বিত কেশ, চিবুকে ধূসর-শ্মশ্রু, অক্ষির পিঙ্গল তারকায় গভীর মর্মভেদী দৃষ্টি। সমস্ত মিলিয়া ইমামকে এমনই সৌম্যদর্শন ও মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছিল যে ভক্ত ও অনুচরদের প্রাণ তাহাতে অপূর্ব উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল। ক্ষণিকের তরে তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও চিন্তা-ভাবনা বিস্মৃত হইল। ঘন ঘন 'আল্লাহু আকবর' রবে তাহারা রণক্ষেত্র কাঁপাইয়া তুলিল।[৩৯]

নিম্নোক্ত উক্তির মাধ্যমেও তাঁর সাহিত্যিক মানসিকতার প্রমাণ মেলে,

> বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুদ্গারের কথা কে না শুনিয়াছে। খৃষ্টীয় ৭৯ সনে উহার প্রথম বিস্ফোরণে পম্পিয়াই, হারকিউলিনিয়াম ও ষ্টেবিয়াই শহর বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তারপর পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত মাঝে মাঝে উহার অগ্নিস্রাব ঘটিয়াছে। আজিও নাকি সেই অগ্নিগর্ভ পাষাণীর অন্তর্জ্বালা নিবৃত্ত হয় নাই। সময় সময় উহার প্রলয় শ্বাস সমগ্র দক্ষিণ ইটালীকে সন্ত্রস্ত করে। হুসায়েন-শোক মুসলিম জাহানে যে অন্তর্দাহের সৃষ্টি করে উহারও বিস্ফোরণ শুধু মদীনা, মক্কা ও কুফায় চরম বিপর্যয় আনে নাই,

Dhaka University Institutional Repository

> পরন্তু পরবর্তী দুইশত বৎসর ধরিয়া উহার অনির্বাণ ধুম্রশিখা ইতিহাসের পাতাকে বিবর্ণ করিয়াছে এবং বহু রাজ্যের উত্থান-পতনের মূলে ক্রিয়া করিয়াছে। এই প্রকার ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সমাপ্তি ঘটে খৃষ্টীয় দশম শতকে, হুসায়েন বংশীয় ইমাম ওবায়দুল্লাহ্ আল মেহ্দী কর্তৃক মিশরে ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায়।[৪০]

উক্ত দুটি বর্ণনায় বরকতুল্লাহর সাহিত্যিক সত্ত্বাই প্রাধান্য লাভ করেছে। সম্ভবত এ কারণেই মাসিক *আল-ইসলাহ* পত্রিকা *কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থটিকে ইতিহাস ও সাহিত্যের মিলিত সমাবেশ গ্রন্থ বলে অভিহিত করেন।[৪১]

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক লেখক। তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যনিষ্ঠতা, ভাবের গভীরতা আর ভাষার প্রাঞ্জলতা। *কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থটিতে শুধু কারবালার কাহিনী নয়, এ কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত তৎকালীন আরবের ইতিহাস, হাশেমী ও উমাইয়া গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিহিংসা এবং কারবালার প্রান্তরে এর শোচনীয় পরিণতি অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু যেমন শোকাবহ, লেখকের ভাষাও তেমনি বলিষ্ঠ ও সাবলিল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১. আল কোরআন, সূরা আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৭৩

২. নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী (২য় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ১৭৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

৬. প্রাগুক্ত, ১৮২

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

৮. আল-কোরআন, সূরা হজ্জ, আয়াত নং-৩৯

৯. আল-কোরআন, সূরা হজ্জ, আয়াত নং-৪০

১০. আল-কোরআন, সূরা মুহম্মদ, আয়াত নং-৪

১১. আল-কোরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৯০

১২. আল-কোরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৯১

১৩. আল-কোরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৯২

১৪. আল-কোরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং-১৯৩

১৫. আল কোরআন, সূরা নেছা, আয়াতঃ ৬

১৬. আল কোরআন, সূরা নেছা, আয়াতঃ ৪

১৭. আল কোরআন, সূরা নেছা, আয়াতঃ ৩৩

১৮. আল কোরআন, সূরা নেছা, আয়াতঃ ৭

১৯. আল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১৮০

২০. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ভাষা শিল্পী বরকতুল্লাহ; মাসিক পূর্বাচল, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৮২, সম্পাদক, মহিউদ্দিন আহমদ, ঢাকা, পৃ. ৬

২১. প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী, বরকতুল্লাহ, (৩য় খণ্ড), পৃ. ৫১৯

Dhaka University Institutional Repository

২২. কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত, বরকতুল্লাহ, (৩য় খণ্ড), পৃ. ১০২

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২৭. Ameer Ali, syed. A short history of the saracens Macmillan & co ltd. London, 1953, P. 45

২৮. কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত বরকতুল্লাহ, (৩য় খণ্ড), পৃ. ১২৯-৩৫

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৩৪. A short history of the saracens, ibid, 1953, P. 46

৩৫. Ibid, P. 50

৩৬. কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত বরকতুল্লাহ, (৩য় খণ্ড), পৃ. ২৫০

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৪১. আল-এসলাম, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দর্শন চিন্তার স্বরূপ এবং বাংলা ভাষায় দর্শন চিন্তার ধারায় তাঁর অবদান

পারস্য প্রতিভা-র জন্য খ্যাত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে দর্শনচর্চায় অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচিত *মানুষের ধর্ম্ম* (১৯৩৩) একটি দার্শনিক গ্রন্থ। *মানুষের ধর্ম্ম, ধ্রুব কোথায়, জড়বাদ, চৈতন্য, বস্তুরূপ ও জীবন প্রবাহ* এই ছয়টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালের আগষ্টে। এর মধ্যে *মানুষের ধর্ম্ম, ধ্রুব কোথায়* ও *জীবন প্রবাহ* বিভিন্ন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে *মানুষের ধর্ম্ম* প্রবন্ধটি *অনন্ত তৃষা, আদিম প্রেরণা* এবং *জীবন ও নীতি* শিরোনামে আলাদা প্রবন্ধরূপে বিন্যস্ত হয়। তাছাড়া *চৈতন্য* ও *বস্তুরূপ* প্রবন্ধ দুটি নামকরণ করা হয় যথাক্রমে *চৈতন্যবাদ* এবং *বস্তুরূপ ও বস্তু*। পরবর্তীতে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের আটটি প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয় নূতন তিনটি রচনা- ১. পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ ২. বিজ্ঞান যুগে ধর্ম ও সভ্যতা এবং ৩. পারমার্থিক জগৎ ও জীবন।[১] ১৯৬৮ সনে *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণটি গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

বরকতুল্লাহর বয়স যখন পয়ত্রিশ বছর তখন *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর কিছু প্রবন্ধ পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর ছাত্রজীবনেই, যখন তিনি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক মাত্র।[২] পারস্য প্রতিভা গ্রন্থের কিছু প্রবন্ধ দার্শনিক ভাবধারায় রচিত। যা তিনি তরুণ বয়সেই রচনা করেন।[৩]

বরকতুল্লাহ দর্শনে শুধু ডিগ্রী প্রাপ্তই ছিলেন না, তা চর্চাও করেছিলেন। *মানুষের ধর্ম্ম* তাঁর দর্শন চর্চার উজ্বল প্রমাণ। বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চার ইতিহাসে *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থটি বিশিষ্ট স্থান দখল

Dhaka University Institutional Repository

করে আছে। অবশ্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে দর্শনের ন্যায় জটিল বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের কম লেখকই লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মানুষের ধর্ম্ম* ও *শান্তিনিকেতন*-এর প্রবন্ধাবলী এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দর্শনচর্চায় বাঙালী লেখকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দ ও কেশবচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। বরকতুল্লাহ এদেরই একজন।[৪] আর বাঙালী মুসলিম লেখকদের মধ্যে বলা যায় বরকতুল্লাহ-ই দর্শন চর্চায় অন্যতম স্বাক্ষর রেখেছেন।[৫]

দর্শনশাস্ত্র একটি জটিল বিষয় তার উপর *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থে এমন কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যা দুর্জেয়ও বটে। তাই এ গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য হওয়া সহজ নয়। তথাপি বইটি পাঠককুলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। *ইস্ট বেঙ্গল টাইমস* প্রথম সংস্করণের ছটি রচনাকেই very thoughtful বলে মন্তব্য করে।[৬] সুকুমার রঞ্জন দাশ *প্রবাসী*-তে লিখেছেন,

> প্রবন্ধগুলি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, সর্ব্বত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদের আলোচনা ও তাহাদের তুলনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুবোধ্য ভাষায় ও সরলভঙ্গীতে বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠকগণ প্রবন্ধগুলি পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। বিশেষতঃ " *জড়বাদ*" ও " *বস্তুরুপ*" শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটী অতি উপাদেয় হইয়াছে! হিন্দ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সর্ব্বপ্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতগুলির সমন্বয়ে এমন চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত রচনা বাংলা ভাষায় খুব অল্পই প্রকাশিত হয়।[৭]

গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ হরিদাস ভট্টাচার্য্য এর দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দেন। উক্ত ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন,

> লেখকের ভারতীয়, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যুৎপত্তি কোথাও তাঁহার স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করে নাই-বরং তাহাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। শিক্ষা তাঁহাকে

Dhaka University Institutional Repository

> ভারাক্রান্ত করে নাই, বরং বাহনরূপে তাঁহার ভাবকে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতি দিয়াছে। পুস্তকটীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে লেখক কোথাও তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রচার করিবার চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁহার নিজের ধর্ম্ম প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। মতবাদের ব্যাখ্যার মূলে আদর্শটি প্রচারিত হওয়ায় তাহা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।[৮]

পারস্য প্রতিভা' র মতো *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থটিও সমালোচকদের নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

অনন্ত তৃষা

মানব মনে বিভিন্ন সময়ে কিছু জটিল প্রশ্নের অবতারণা হয় যেমন জীবন জগৎ, ইহকাল-পরকাল, আত্মা-পরমাত্মা, জড় প্রকৃতি-মনোজগৎ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তিতে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন।[৯] *মানুষের ধর্ম্ম* বিভিন্ন নামে বর্ণিত এগারটি রচনার সংকলন হলেও পর্যালোচনায় একটি মূল বক্তব্য ফুটে উঠে তাহলো সমগ্র বিশ্বব্যাপী 'চৈতন্যের সর্বময়তা'।[১০] মূলত তাঁর দর্শনের ভিত্তিই আলোচিত হয়েছে এক বিশ্বময় চেতনার অস্তিত্বের উপর।[১১]

বরকতুল্লাহর মতে বিশ্বময় এই চেতনার প্রকাশ কেবল জীবজগতে নয় বস্তুজগতেও বিদ্যমান। গোপনীয় এক শক্তির অনুপ্রেরণায় বিশ্বমণ্ডলের সবকিছু বিরাজমান। লোহার সাথে চুম্বকের গভীর সম্পর্ক, দিকদর্শন যন্ত্রের কাটা সর্বদা সুমেরুর দিকে মুখ করে থাকা, অণু-পরমাণুর পারস্পরিক সম্পর্ক, চন্দ্রের আকর্ষণে সাগরে জলরাশির পরিবর্তন, সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলির আবর্তন এসব কিছু সেই গোপন প্রেরণার প্রভাবেই ঘটে থাকে বলে বরকতুল্লাহর বিশ্বাস। লেখকের মতে, সৃষ্টি জগতের সবকিছুর মধ্যে স্বাভাবিক একটি ধর্ম লক্ষ্য করা যায় তা হলো আত্ম প্রতিষ্ঠার ধর্ম। জীব ও জড় উভয় জগতেই এই ধর্ম বিদ্যমান। তিনি একটি উপমার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রকাশ করেছেন এভাবে সামান্য লোষ্ট্র খণ্ডকে যদি কেউ অপসারণ করতে চায় সে সহজে নড়িবে না। সে প্রতিরোধ করবে। তাকে পদাঘাত করলে সেও প্রতিঘাত করে বেদনা দিবে।[১২]

উদ্ভিদ জগতে আত্ম প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াস আরও সুস্পষ্ট। সামান্য লতাটিও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে শুধু নিজে বাঁচে না বংশধরের মধ্য দিয়ে নিজেকে সে প্রসারিত করতে চায় অনন্ত জীবন প্রবাহে। সেজন্য প্রকৃতি রেখে যায় উত্তরসূরী। এ সম্পর্কে বরকতুল্লাহর বক্তব্য হচ্ছে,

> ...জীবজগতের প্রকৃতিতেই এমন একটী প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে যে যাহা আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং সন্তান যখন আপনার পায়ে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে তখন উহা আপনি প্রশমিত হইয়া আসে। জীব সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করে না। তাহার অভ্যন্তরীণ জৈবশক্তি (life force) তাহার ভিতর দিয়া লীলা করিতেছে, দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া যুগমঞ্চে বিচরণ করিতেছে। জীব সেই জৈবশক্তির অভিব্যক্তির আধার মাত্র।[১৩]

লেখকের মতে, জীবজগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-প্রসারের যে ধর্ম সক্রিয় তা মানুষের মধ্যেও সমভাবে বিরাজিত। বরকতুল্লাহ বলেন, মানুষের মধ্যে আছে আরেকটি নতুন শক্তির বিকাশ, যার নাম আত্মা। অনন্তকাল ধরে মানুষের বেঁচে থাকার যে ইচ্ছা মানুষ তা বাস্তবায়ন করতে চায় আত্মার মাধ্যমে। তাই আত্মা কল্পিত হয়েছে অবিনশ্বররূপে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহের পরিসমাপ্তি ঘটলেও আত্মা বেঁচে থাকবে এবং কর্মফল ভোগ করবে। এজন্যে মানুষের কল্পনার জগতে স্থান পেয়েছে স্বর্গ নরক। ভারতীয়, খ্রিস্টীয়, গ্রীসীয় ও আরবীয় জাতি ধর্মে স্বর্গের যে কল্পনা তার চিত্র তুলে ধরে লেখক বলেছেন, এসব কিছু কারো কাছে অলীক প্রহেলিকা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর পেছনে সমগ্র মানবের অনন্তকাল বেঁচে থাকার যে ব্যকুলতা রয়েছে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। লেখকের মতে, মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে বাস্তবকে রেখে অবাস্তব আদর্শের পেছনে যে ছুটে চলে তার পেছনে রয়েছে আত্ম প্রসারণেরই তীব্র আকাঙ্খা যা নির্দিষ্ট কোন জাতির বিশেষজ্ঞ নয় সমগ্র মানবজাতিরই এক অন্তপ্রেরণা।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

বরকতুল্লাহর মতে এই প্রেরণা বা চেতনা-সত্তা জগতে বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে চলছে। হযরত মুসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মুহম্মদ (সাঃ) প্রমুখ মহাপুরুষ এই পরম সত্তাকেই গ্রহণ করেছেন 'আল-লাহ' বলে। লেখক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরম সত্তার অনুসন্ধানের দীর্ঘ বিবরণও উল্লেখ করেছেন।[১৫]

এ সকল মহাপুরুষগণ সকলেই পরম সত্তাকে আবিষ্কার করেছেন সবকিছুর আদি উৎস ও শেষ পরিণতি বলে। বরকতুল্লাহ মনে করেন এই উপলব্ধিতে পৌঁছানো মানুষের পক্ষে একরকম অনিবার্য। চৈতন্যের একত্ব থেকে বহুত্বের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বরকতুল্লাহ বলেন,"দেখা যাইতেছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির তাড়নায় ও পর্য্যবেক্ষণের নেতৃত্বে আমরা যে পথেই পরিক্রমণ করি না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিশেষে এক মননশীল ও সৃষ্টিধর্ম্মী চৈতন্যের এলাকায়ই আসিয়া পড়ি। একেশ্বরবাদ বা তৌহিদের সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই।"[১৬]

আদিম প্রেরণা

আদিম প্রেরণা লেখকের এক দীর্ঘ প্রবন্ধ । উক্ত প্রবন্ধে বিশ্বময় প্রেরণা ও সনাতন সত্যের যে বর্ণনা বরকতুল্লাহ দিয়েছেন তাতে তাঁর ভাববাদী আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তির পরিচয় যেমন ফুটে উঠে, তেমনি পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রগার ধর্মানুরাগের। *অনন্ত তৃষা*'র স্বরূপ বিশ্লেষণের পর লেখক আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-প্রসারণকেই মানবের আদিম প্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধে। লেখক প্রতিটি সৃষ্টির অন্তরে একটা উন্মাদনা, একটা মোহময় মত্ততা লক্ষ্য করেছেন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে একটা অজানা আকর্ষণ সৃষ্টি জগতে বিরাজমান। তাই শুধু প্রেরণা ও সত্যের কথা বলেই তিনি থেমে যান নি, গুরুত্ব দিয়েছেন তাকে অনুধাবন ও অনুসরণের উপর। বরকতুল্লাহর মতে মানুষ যেহেতু আদিম প্রেরণার ভিতর দিয়ে সৃষ্টি সেহেতু তার গতিধারা থেকে সে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম তাকে তিনি মোহান্ধ বলেছেন। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তার বক্তব্য, "পানির ধর্ম্ম যেমন নিষিক্ত করা, অগ্নির ধর্ম্ম যেমন দাহন করা, মানুষের ধর্ম্ম তেমনি আপনার সত্যকার রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সসীমের গণ্ডী পার হইয়া অসীমের সহিত একাকার হওয়া।"[১৭] *আদিম প্রেরণা* প্রবন্ধের অন্যত্র লেখক

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, "শাশ্বত সত্যের সহিত যে একাত্ববোধ, ইহাতেই মানবাত্মার সার্থকতা। মৎস্য যেমন পানিতে জীবনের সার্থকতা অনুভব করে, উদ্ভিদ যেমন আলো ও বাতাসে স্বস্তি অনুভব করে, শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, আত্মাও তেমনই একমাত্র পরমার্থেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ মনে করে।"[১৮] লেখকের মতে, এ শাশ্বত সত্যের সাথে একাত্ববোধেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। বরকতুল্লাহর মতে, ধর্মীয় অনুভূতির মধ্য দিয়েই সাধারণত পরম সত্তাকে অনুভব ও অনুসরণ করা সম্ভব। ধর্মই হচ্ছে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম ।

জীবন ও নীতি

জীবন ও নীতি একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। পূর্বের প্রবন্ধদ্বয়ের আলোচনার সাথে উক্ত প্রবন্ধের যোগসূত্র রয়েছে। *জীবন ও নীতি* শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক অগাষ্ট কোঁতে (১৭৮৯-১৮৫৭), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ও হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৮৯২) এই তিনজন পাশ্চাত্য মনীষীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে তাদের পার্থিব আদর্শের উপর ভিত্তি করে মানব কল্যাণ চিন্তার সমালোচনা করেছেন। স্পেন্সার জড় প্রকৃতিকে সমষ্টি হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং মানব সম্প্রদায়কে তার একটি অংশ হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। স্পেন্সার বলেন, প্রকৃতির বিকাশে সহায়তা দানেই মানবজীবনের সার্থকতা। অপরদিকে মিল সমগ্র মানবজাতিকে সমষ্টিরূপে কল্পনা করে সেই সমষ্টির সুখ বৃদ্ধিকেই মানবের কর্তব্য বিবেচনা করেন। কোঁতে মানুষকেই সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করেন। মানুষের চেয়ে আর কাউকেই শ্রেষ্ঠ বলে তার কাছে মনে হয় নি। এই তিন মনীষীর মতাদর্শে স্রষ্টার অস্তিত্ব ও প্রচলিত ধর্ম উপেক্ষিত হওয়ায় লেখক এই তিনজনের কারো মতকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি।[১৯] লেখক এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের কথা বলেন নাই। তিনি মানুষের অন্তরের ধর্মকেই ধর্ম হিসেবে বুঝিয়েছেন। যা মানবের এক চিরন্তর প্রেরণা, মানুষের জীবনের অন্তস্থল হতে যা প্রবাহিত, যার মধ্যে রয়েছে শাশ্বত সত্যের প্রকাশ। স্রষ্টা বলতেও তিনি ধর্ম কেন্দ্রিক ঈশ্বরকে বোঝান নি।[২০] লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০১) মত

Dhaka University Institutional Repository

তিনিও মানুষের মধ্যে প্রেমের দেবতাকে উপলব্ধি করেছেন। বরকতুল্লাহ বলেন, "মানুষ কবে বুঝিবে যে স্বর্গের যিনি মালিক তিনি তাহার অন্তরেই বিরাজ করিতেছেন।"[২১]

বরকতুল্লাহর ধারণা সত্যকে চেনা বা অনুভব করার জ্ঞান থাকলে অন্তরের ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে। লেখকের মতে এই সত্যের ফলেই জাতিগত ও ধর্মগত বিভেদের অবসান ঘটবে এবং মানবজাতি সত্য ও সুন্দর যুগ ফিরে পাবে।

লেখক নিজেকে নাস্তিকতা ও ইহলৌকিকতা থেকে মুক্ত রেখেই মানুষের ধর্ম অনুসন্ধান করেছেন। তবে তিনি প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকে মানুষের ধর্ম হিসেবে বর্ণনা করেন নি। লেখক মনে করেন সত্যকে জীবনের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই মানব জীবনের সার্থকতা। আর এই সার্থকতার মধ্যেই চরম সুখ নিহিত। তাকে লাভ করার সাধনাই মানবের অন্যতম সাধনা হওয়া উচিত। তাঁর মতে আত্মার অমরত্ব লাভের এক অনন্ত প্রচেষ্টা মানবের মনে বিদ্যমান। মানুষের সসীম গণ্ডী অতিক্রম করে অসীমের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াই মানুষের প্রকৃত ধর্ম।[২২]

ধ্রুব কোথায়

মানুষের ধর্ম্ম গ্রন্থের একটি দীর্ঘ ও অনুসন্ধিৎসামূলক প্রবন্ধ হলো *ধ্রুব কোথায়*। *ধ্রুব কোথায়* প্রবন্ধটিকে লেখক পাঁচটি শিরোনামে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি হলো *চিরন্তন জিজ্ঞাসা*, *অশরীরী প্রাণী*, *ভারতীয় উপনিষদ ও ষড়্দর্শন*, *গ্রীকদর্শন*, এবং *প্লেটোর অতীন্দ্রিয় জগৎ*।

চিরন্তন জিজ্ঞাসা

আলোচ্য প্রবন্ধের *চিরন্তন জিজ্ঞাসা* অংশে লেখক হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর জীবনে ধ্রুবের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই অংশে মানবজীবনে সত্য অনুসন্ধানের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

বরকতুল্লাহর মতে, "হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর জীবনে যে ধ্রুবের জন্য অনুসন্ধিৎসা বিকাশ লাভ করিয়াছিল মানবের জাতীয় ইতিহাসে ইহা নূতন ঘটনা নহে। মানুষ এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে নিরবলম্ব থাকিতে পারে না। তাহার প্রাণ চায় কোনও সনাতন সত্যের আশ্রয়।"[২৪]

এই অংশে লেখক মূলত বোঝাতে চেয়েছেন জ্ঞান চর্চা ছাড়া সত্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সত্যের সেই পরম সৌন্দর্যের কাছে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন জ্ঞানের অনুশীলন।

অশরীরী প্রাণী

অশরীরী প্রাণী অংশে মিশর, গ্রীক ও প্রাচীন ভারতবাসীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব অশরীরী প্রাণী পূজা-অর্চনা লাভের মাধ্যমে স্রষ্টার আসনে সমীসীন হয়েছিল সে সম্পর্কে বরকতুল্লাহ আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন ভারতবাসীদের উদাহরণ টেনে লেখক বলেন, "ভারতবাসীদের কোনও কোনও দেবতা হিমাচলবাসী। অনেক দেবতা গোলকে থাকেন ; অনেকে থাকেন কৈলাস শিখরে। দেবতাদের ভিতর যাতায়াত আত্মীয়তা ও বিবাহাদি চলিত। এক একজন দেবতাকে পৃথিবীর এক বা একাধিক কার্য্যের অধিনায়ক মনে করা হইত।"[২৫]

ভারতীয় উপনিষদ ও ষড়দর্শন

বরকতুল্লাহ রচিত *ধ্রুব কোথায়* প্রবন্ধে *ভারতীয় উপনিষদ ও ষড়দর্শন* একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাংখ্যমত ও বেদান্তের বিষয় নিয়ে আলোচন করা হয়েছে উপনিষদ আলোচনায়। সাংখ্য মতে পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই জড়ের বিকার। জড় প্রকৃতি লীলা করছে আর আত্মা তাহা উপলব্ধি করছে। এখানে আত্মা নির্বিকার।[২৬]

অপরদিকে বেদান্তের ধারণা জড় প্রকৃতি কোনও সত্তা নহে, ইহা মায়া মাত্র। জগৎ মিথ্যা তবে আত্মা বিভক্ত নয় আত্মা ব্রহ্মেরই অংশ। কিন্তু বরকতুল্লাহর মতে, বেদান্তের ধারণা অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষ ধ্রুব অনুসন্ধানে ব্যর্থ হওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে বৌদ্ধ, জৈন, পৌরাণিক ও বৈষ্ণবাদিসহ অন্যান্য লৌকিক ধর্মের।[২৭]

মূলত *ভারতীয় উপনিষদ ও ষড়দর্শন* অংশে লেখক ভারতীয় উপনিষদ ও ষড়দর্শন কিভাবে সত্যের অনুসন্ধান করেছে সে বিষয়ে সাবলিল ভাষায় জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।

গ্রীক দর্শন

ধ্রুব কোথায় প্রবন্ধের *গ্রীক দর্শন* অংশে লেখক গ্রীকদের সত্য অনুসন্ধানের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গ্রীক দর্শনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক থেলিস (খ্রিঃপূঃ ৬২৪-৫৪৮), এনাক্সিমেনিস (খ্রিঃপূঃ ৫৮৮-৫২৪), এনাক্সাগোরাস (খ্রিঃপূঃ ৫০০-৪২৮), এমপিডোক্লিস (খ্রিঃপূঃ ৪৮৩-৪২৩), ডিমোক্রিটাস (খ্রিঃপূ ৪৬০-৩৭০), সক্রেটিস (খ্রিঃপূঃ ৪৬৯-৩৯১) প্রমুখ দার্শনিকদের জড়বাদী মতবাদসমূহ তুলে ধরেন।[২৮]

প্রকৃতির ভিতর ধ্রুবের অনুসন্ধান করে থেলিস যে সত্যে উপনীত হয়েছেন তা হলো পানিই পৃথিবীর আদি, পানিই পৃথিবীর শক্তিরূপী অবিনশ্বর উপাদান, পানিই জগতের মূল সত্তা আর সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী ও 'কার্যফল' মাত্র।[২৯] এনাক্সিমেনিসের মতে, বায়ু সকল জীবের প্রাণ। বায়ু ছাড়া জীব, উদ্ভিদ, কিছুই বাঁচে না। তাই বায়ুকেই তিনি জগতের মূল উপাদান বলেছেন। এমপিডোক্লিস এর মতে, মাটি, পানি, আগুন ও বায়ু এই চারটি বিশ্বের মূল উপাদান। এনাক্সাগোরাস তার সমসাময়িক দার্শনিক এমপিডোক্লিস এর চেয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়ে বলেন, বিশ্বের মূল উপাদান চারটি নয়, অসংখ্য। তারা নির্জীব। কোন সচেতন আত্মিক শক্তি তাদের ভিতর গতি সঞ্চার করে।

ডিমোক্রিটাস দৃশ্যমান জড় অণুর সূক্ষ্মাংশরূপে পরমাণুর পরিকল্পনায় উপনীত হয়ে বলেন পরমাণুগুলি অবিভাজ্য, অতিসূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। গঠন, আকার ও ওজনে ভিন্নতা থাকলেও গুণগত দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জড়ের স্বরূপ বিশ্লেষণে ডিমোক্রিটাসের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

অবিস্মরণীয়। ডিমোক্রিটাসের জড় প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণের পর আর্বিভাব ঘটে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ও প্লেটোর। যুবক শ্রেণীর ধর্মীয় নিষ্ঠা ও নৈতিক মানোন্নয়নের জন্য সক্রেটিসের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সক্রেটিসের বক্তব্য ছিল জ্ঞান চর্চার মূল উদ্দেশ্য মানুষের নৈতিক উন্নতি, সেজন্য মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে জাগ্রত রাখাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। সক্রেটিস জড় প্রকৃতির বিশ্লেষণের স্থলে অন্তরের দিক থেকে সত্যানুসন্ধানের ধারা সৃষ্টি করেন।[৩০] পরবর্তীতে সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো যাকে ভাববাদে পরিণত করেন।

প্লেটোর অতীন্দ্রিয় জগৎ

সৃষ্টি জগতের সকল পৃথক শ্রেণীকে প্লেটো আইডিয়া বলে অভিহিত করেন। প্লেটোর মতে এই আইডিয়া অস্তিত্বশীল একেকটি সচেতন বা অবচেতন আত্মা, শুধুমাত্র মানসিক ধারণা নয়। সকল আত্মাই চিরন্তন ও ধ্রুব। এদের উর্ধ্বতম হচ্ছে বিশ্ব আত্মা। এই বিশ্ব আত্মার প্রভাবেই সকল আত্মা সঞ্জীবিত। পরবর্তী সময়ে প্লেটোর ভাববাদী চিন্তাভাবনা ভাববাদী দার্শনিকদের হাতে আরও বিকশিত হয়েছে। জড়বাদের স্থলে ভাববাদকে প্রতিষ্ঠিত করলে মোহম্মদ বরকতুল্লাহকে ভাববাদের অনুসারী বলা যায়।[৩১] তবে এ প্রবন্ধের শেষে বরকতুল্লাহ প্লেটোর আইডিয়ালিস্ট চিন্তাচেতনার কিছু মন্তব্য তুলে ধরেন এভাবে,

> জগতে যা কিছু পাপ, যা কিছু অপূর্ণতা, যা কিছু কুৎসিত, সমস্তই জড়ের উৎপাদিত বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই জড় কোথা হইতে আসিল, কে তার স্রষ্টা, কেন উহা এরূপে বিশ্ব-আত্মার কার্য্যে বাধা দিয়া বিদ্রোহ আনয়ন করিতেছে, এ সকল প্রশ্নের কোন পরিস্কার সমাধান প্লেটোর দর্শনে মিলেনা। আত্মা যদি ধ্রুব হয়, তবে তাহারই সহচর জড়কে কোন স্থান প্রদান করা হইবে ? ... আত্ম জিজ্ঞাসায় তাঁহার দর্শনের সূত্রপাত, তাঁহার সকল মীমাংসাই নিছক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবতার সহিত উহার সম্বন্ধ অতি অল্প। তাই আধুনিক প্রমাণ সর্ব্বস্ব যুগে প্লেটোর দর্শন আর তেমন সকলে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

প্লেটোর অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে আলোচনার পর লেখক তাঁর পরবর্তী প্রবন্ধে বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

জড়বাদ

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ *জড়বাদ* প্রবন্ধে *জড়ের সৃষ্টিশক্তি, মৌলিক পদার্থ, জড়শক্তির মৌলিকত্ব, জড় হইতে চেতনার উদ্ভব* এবং *চৈতন্যের অলীক মাহাত্ম্য* নিয়ে আলোচনা করেছেন। *জড়বাদ* প্রবন্ধে লেখক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন। জীবন জড় ও চেতনার সংহতি মাত্র। জড় এবং চেতনায় যতক্ষণ পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে তখনই আমরা জীবিত। সেখানে চেতনার অবসান হলে জড় পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। এ দুয়ের ভিতর কোনটি ধ্রুব এবং কোনটি অস্থায়ী সে প্রশ্নে জড়বাদী জড় পরমাণুর পক্ষে, চেতনার নিত্যতায় সন্দিহান। লেখকের মতে চেতনা, জড়েরই সাময়িক বিকৃতি মাত্র। জড়বাদীদের মতে চেতনা সর্বতোভাবে জড়েরই সাপেক্ষ। জড় থেকে চেতনার উৎপত্তি সম্পর্কে তাদেরকে কোন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় নি। মানবজাতির জ্ঞান, চিন্তাশক্তি, সৃষ্টিশীলতার উৎপত্তিস্থল হলো মস্তিষ্ক কোষ। যা জড় উপাদান দ্বারা তৈরী। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক, দেখা যায় জড়ই জীবনের ভিত্তি।[৩৩]

নানাবিধ প্রশ্নের অবতারনা করে ভাববাদী ধারণার বিপরীতে প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক উল্লেখ করেন,

> জগৎ-কারণের এখনকার এই চৈতন্য-স্বরূপ মূর্ত্তি একদিন পরিবর্ত্তন লাভ করিবে। রূপকের মোহ ঘুচিলেই মানুষ বিস্ময়ে দেখিবে, একদিন যাহাকে সে চৈতন্য বলিয়া পূজা দিয়াছে সে জড়েরই একটা সাময়িক রূপান্তর মাত্র। মায়াবী জড়ই চৈতন্য রূপে হাসিতেছে। তাহাকেই এতদিন মানুষ কত দয়া দাক্ষিণ্যের অবতার বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে! যে বাণী সত্য তাহা কঠোর হইলেও অনস্বীকার্য্য এবং নমস্য। নির্ম্মম জড়ই যে এতদিন চৈতন্য-রূপে আমাদের অর্চ্চনা গ্রহণ করিয়াছে, এ তথ্য মর্ম্মান্তিক হইলেও জড়বাদীর মতে ইহা সত্য এবং ইহার আবিষ্কারে মানব আপনাকে ধন্য জ্ঞানই করিবে।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

জড়বাদ প্রবন্ধে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ জড়বাদ সম্পর্কে যেভাবে যুক্তি তুলে ধরেছেন তাতে তাকে জড়বাদের সমর্থক হিসেবে গণ্য করা যায়। কিন্তু জড়বাদ সম্পর্কে লেখকের এই অবস্থান যে সাময়িক তা তার রচিত অন্য প্রবন্ধ বিশ্লেষণে সহজেই বুঝা যায়।

চৈতন্যবাদ

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত *চৈতন্যবাদ* একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে জগৎ রহস্য সম্পর্কে দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে লেখক যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এমন এক সময় ছিল যখন মানুষের সৃষ্টি জগতের রহস্য সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। যে যা বলতো তাই অন্ধভাবে বিশ্বাস করতো। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে মানুষের এ অন্ধবিশ্বাসের অবসান ঘটে। *চৈতন্যবাদ* প্রবন্ধ পর্যালোচনায় লেখকের ভাববাদী মনোভাব যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তেমনি জড়বাদের বিপরীতেও তার অবস্থান আরো শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়। বরকতুল্লাহর মতে জড়বাদ বস্তুজগৎ সম্পর্কে আলোচনা করলেও মনোজগৎ নিয়ে চুড়ান্ত কোন পর্যালোচনায় যেতে পারে নি। *চৈতন্যবাদ* প্রবন্ধে জড়বাদের বিরূদ্ধে বরকতুল্লাহ যেসব যুক্তি ও মতামত তুলে ধরেছেন তা উন্নত দার্শনিক আলোচনার পর্যায়ে পড়ে না । লেখক বলেছেন , জড়বাদী যে বস্তুজগৎকে বিশ্লেষণ করছে তাও চৈতন্যেরই সাহায্যে।[৩৫] এ প্রসঙ্গে বরকতুল্লাহ বলেন,

> মানুষকে চেতনা হইতে বঞ্চিত কর, ডিনামাইট ও সাবমেরিন আর গঠিত হইবেনা; ছাপার অক্ষর ও তারের খবর আর স্কুলের ছেলে বা ডাক-হরকরাকে বিরক্ত করিবেনা ; জ্ঞানের দেউটী নিভিয়া যাইবে, অযুতকোটী ইঞ্জিনের সুদৃঢ় কব্জা ঝন্ ঝন্ করিয়া খসিয়া পড়িবে! জড়বাদী হয়ত বলিবেন, জ্ঞানের দেউটী নিভিল-তো কি হইল! জ্ঞানত একটী সাময়িক বিকাশ মাত্র। নিভাইয়া দাও সে ক্ষীণ প্রদীপ, অনন্ত জড় সমুদ্র আপনার গৌরবে অক্ষুণ্নই রহিয়া যাইবে।[৩৬]

জড়বাদ সম্পর্কিত লেখকের এ ধারণা তার কল্পনা প্রসূত। কেননা বস্তুবাদীরা জড়বাদ সম্পর্কে এধরনের কোন মন্তব্য করে নাই। দর্শনের একটি জটিলতম বিষয় হলো সৃষ্টি জগতে এক থেকে বহুত্বের বিকাশ, বরকতুল্লাহ এ বিষয়ে বেদান্ত এবং প্লেটো ও লাইবনিজ (১৬৪৬-

Dhaka University Institutional Repository

১৭১৬) এর চিন্তাধারা বিশ্লেষণের পর মন্তব্য করেন, সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে অভিন্ন পদার্থের পর্যায়ক্রমে বহুত্বে বিভক্ত এবং জড়ে প্রাণ সঞ্চারণের বিষয়টি বৈজ্ঞানিকের নিকট চির অজ্ঞাতই থাকবে।[৩৭] অভিন্ন পদার্থের ক্রমান্বয়ে বহুধা বিভক্ত প্রসঙ্গে বরকতুল্লাহ অধ্যাত্মবাদীর মতকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। অধ্যাত্মবাদীর মতে, "দৃশ্যমান জগতের এই বহুধা বিভক্ত বৈচিত্র, প্রাণী জড় ও উদ্ভিজ্জের এই কোটী কোটী রকমের প্রকার ভেদ, এ সমস্ত সৃষ্টিধর্ম্মী চৈতন্যেরই বহুমুখীন প্রকাশ ও তাহারই সজন বিলাস।"[৩৮] লেখকের মতে তাই বহুত্বের মূলে রহিয়াছে একই উদ্দেশ্যের যোগসূত্র । এভাবেই তিনি ভাববাদী দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা-চেতনার পরিচয় দেন। এছাড়াও জড় পদার্থের জীবনীশক্তি প্রসঙ্গে লেখক প্রশ্ন করেন, "জড়বাদী যাহাকে জড়পদার্থ বা জড়শক্তি বলিয়া পরিকল্পনা করিতেছেন তাহা যে কোনও জীবন্ত শক্তির বাহ্য প্রকাশ নহে তাহাই বা কে বলিল ? ... ইট পাথর বা সোনা রূপার ভিতরেও যে চেতনা আড়ষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে না তাহা কে বলিতে পারে।"[৩৯]

চৈতন্যবাদ প্রবন্ধ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, লেখক এভাবে দর্শনের যুক্তিবাদী অবস্থান থেকে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে যুক্তিহীন এক বিশ্বাসের জগতে অগ্রসর হন।[৪০]

বস্তুরূপ ও বস্তু

বস্তুরূপ ও বস্তু প্রবন্ধে লেখক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । এ প্রবন্ধেও লেখক জড় ও চেতনার অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। *বস্তুরূপ ও বস্তু* শীর্ষক প্রবন্ধে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যাখ্যাসহ লেখকের কিছু বক্তব্য ছিল বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে লেখক বিজ্ঞানের যুক্তিতে স্থির থাকতে পারেন নি। বাহ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে স্নায়ুতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষকে সহায়তা করে বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা লেখকের কাছে যথেষ্ট নয়। লেখক বস্তু ও স্নায়ুতন্ত্রের মাঝে মন নামক একটি চৈতন্য প্রক্রিয়ার কল্পনা করেন এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রের বস্তু-জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করেন। এই সীমাবদ্ধতা বা অসম্পূর্ণতা থেকে লেখকের প্রশ্ন, যে মানুষ নিজের জৈবদেহের মধ্যে কী ঘটছে সেটাই ভালভাবে জানে না মহাবিশ্বের আদিস্বরূপ তার পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

উদঘাটন করা কীভাবে সম্ভব ? প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে লেখক দর্শনের যুক্তিশীলতাকে অগ্রাহ্য করে অধ্যাত্মবাদের মতকেই গ্রহণ করেন। পরিশেষে তিনি তাদেরকেই ভাগ্যবান মহামানব বলেন, যারা সকল ইন্দ্রিয়পথ রুদ্ধ করে জাগতিক অনুভূতি সমূহের উর্ধ্বে উঠে বিক্ষোভহীন নিরালায় পরম সত্তার সন্ধান পেয়েছেন।[৪১] লেখকের এই মন্তব্যে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে বিজ্ঞানীরা মহামানবের পর্যায়ে পড়েন নি।

জীবন প্রবাহ

জীবনপ্রবাহ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক জীবনের মূল উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। লেখক প্রথমেই ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গসেঁর (১৮৫৯-১৯৪১) বক্তব্য তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন, মানবের ক্ষুদ্র দেহ পরিসরে প্রাণশক্তির যে অনুভব তা বিশ্বজনীন আত্মিক জীবনেরই অংশ। অনেকেই মনে করেন, মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু লেখকের মতে, জীবন বুদ্ধিবৃত্তির চেয়েও বৃহত্তর একটি সত্তা ; তা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে চলে না। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সংস্কার আমাদের প্রাত্যহিক জ্ঞানের বাহন। কিন্তু এদের সাহায্যে পরম সত্তার সাক্ষাৎ জ্ঞান পাওয়া যায় না। তবে এগুলো ছাড়াও মানব মনের অন্য একটি শক্তি আছে লেখক যার নাম দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় অনুভব শক্তি বা স্বজ্ঞা।[৪২] লেখকের মতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ছাড়া জীবনের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়। লেখক মনশ্চক্ষুর উদঘাটনকেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বলেছেন। তিনি বলেন যারা আত্মিক সাধনায় চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন তাদের মনশ্চক্ষু এমনভাবে খুলে যায় যে, তাদের সকল কাল বর্তমানে পরিণত হয়, সকল রহস্যের জট খুলে যায়। এসব কিছুরই লক্ষ্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে প্রাধান্যদান। এভাবেই লেখক ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তি থেকে সরে গিয়ে নিজেকে দাঁড় করান অধ্যাত্মবাদের সারিতে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে লেখকের অধ্যাত্মচেতনার স্বরূপ প্রকাশিত হবে,

> ক. প্রবাসী পুত্রের বিপদপাদে সুদূর গৃহে বসিয়াই জননী তাহার ব্যথা অনুভব করেন, ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

খ. স্বামী বিপদাপন্ন হইলে সাধ্বী স্ত্রীও তাহা দূর হইতে বুঝিতে পারে। এই অনুভবশক্তি অনুশীলন দ্বারা এতই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে যে, সাধু পুরুষেরা গৃহে বসিয়া সমগ্র বিশ্বের কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। অতি সাধারণ মানুষেরাও চিন্তার প্রগাঢ়তা দ্বারা অন্যের মানোভাব ধারণা করিতে পারে।[৪৪]

গ.স্বপ্নের ভিতরও অনেক সময় গায়েবী, অজানা খবর লাভ করা যায়। দুইটী লোক একই স্বপ্ন দেখিয়াছে, ইহাও অনেক সময় দেখা যায়।[৪৫]

ঘ. দেশ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ জীব আমরা, আমাদের এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা বাহ্য জগৎকে বুঝিতে পারি; কিন্তু তার অতীত আরও কোন সন্ধান পাইতে হইলে ঐ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালা ভিন্ন বোধ হয় অন্য গতি নাই।[৪৬]

ঙ. প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধকদের পক্ষে দুই একটী ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারা বা গৃহে বসিয়া বাহিরে কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা বলিতে পারা, অতি নিম্নস্তরের সাফল্য। যাঁহারা আত্বিক সাধনায় বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের মনশ্চক্ষু এমন ভাবে খুলিয়া যায় যে তাঁহাদের নিকট সকল কাল বর্তমানে পরিণত হয় , সকল দেশ সম্মুখীন মনে হয়, সকল পদার্থ স্বচ্ছ হইয়া আসে।[৪৭]

এসব বক্তব্য থেকে লেখকের অতিলৌকিক বিশ্বাসের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বরকতুল্লাহর বিশ্বাস স্বজ্ঞার সাহায্যে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রমাণ পরখের অপেক্ষা রাখে না। বরকতুল্লাহর দার্শনিক চিন্তাধারা, বিশেষ করে স্বজ্ঞা সম্পর্কে তার ধারণার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক আবদুল হক বলেন,

এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ভিত্তি কি এবং কোথা থেকে এ অনুভূতি আসে তা প্রমাণ দিয়ে বোঝাবার উপায় নেই এ উক্তি তিনি পরমুহূর্তেই করেছেন, কিন্তু এই অনুভূতিরই উপরই তাঁর অটল আস্থা। বস্তুত চিন্তার ক্ষিত্রে তিনি মরমীয়াবাদী। দর্শনালোচনা আরম্ভ করে এই ভাবে তিনি কার্যত দর্শনকে বর্জন করেছেন কেননা

Dhaka University Institutional Repository

> দর্শনের প্রধান কথা যুক্তি প্রমাণ। কোনো দর্শনই বিজ্ঞান ও তার যুক্তি প্রমাণকে উপেক্ষা করে অথবা তার বিরোধিতা করে দাঁড়াতে পারে না।[৪৮]

চিন্তার ক্ষেত্রে বরকতুল্লাহ মরমীয়াবাদী আবদুল হকের এ মন্তব্য যথার্থ হলেও বরকতুল্লাহ দর্শনকে বর্জন করেছেন অথবা বিজ্ঞান ও তার যুক্তি প্রমাণকে উপেক্ষা করেছেন এ মন্তব্য মনে হয় সঙ্গত নয়। কেননা বরকতুল্লাহ বিজ্ঞান বিরোধী নন, বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। বরকতুল্লাহ বিজ্ঞানের প্রশংসাও করেছেন। তিনি বিজ্ঞানের প্রশংসা স্বরূপ বলেন বিজ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে শাণিত করে এবং বুদ্ধির স্তরে জ্ঞানের সীমানা বিস্তৃত করে।

পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ

বরকতুল্লাহ রচিত *পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ* প্রবন্ধে পরমাণু রহস্য, পরমাণুর তেজোময় শক্তিরূপ, আলোক ও সৌর জাগতিক রশ্মিসমূহের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণশক্তি সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক মহাবিশ্বের কিছু কার্যক্রমকে রহস্যময় ও মানুষের জ্ঞান বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে *আলোক ও সৌরজাগতিক রশ্মিসমূহ* শিরোনামের লেখায় বরকতুল্লাহ বলেন,

> ...বিদ্যুৎ-চুম্বক শক্তি ও মাধ্যাকর্ষণের ভিতর সাদৃশ্য অতি আশ্চর্য্যজনক। গ্রহগুলি সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ এলাকার ভিতর আবর্তন করে। তার উপর যে কেহ চুম্বক ব্যবহার করিয়াছে সেই জানে পৃথিবী একটী বৃহৎ চুম্বক। সূর্য্যেরও একটী চুম্বকক্ষেত্র আছে। প্রত্যেক তারারও তেমনি আছে। ইহা হইতে মাধ্যাকর্ষণ ও চুম্বকশক্তি যে একই ব্যাপার ইহা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু সে চেষ্টা এ যাবৎ ফলবতী হয় নাই।[৪৯]

লেখক এক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ টেনে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কি করিয়া উহার আকর্ষণ লোহাতে পৌঁছে তাহা জানা যায় না। কম্পাস কেন সতত উত্তরমুখীন থাকে ? কোন গোপনচারী শক্তি শন্যলোক পাড়ি দিয়া, মানুষের দৃষ্টির অগোচরে কম্পাসের আঙ্গিনায় হানা দেয় এবং উহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে ; কোন্ পথে কিসের মাধ্যমে উহার এই আনা গোনা চলে, এ প্রশ্নের জবাব আজিও মানুষের জ্ঞানের বহির্ভূত রহিয়াছে।[৫০]

লেখকের মতে রহস্যময় চুম্বক, কম্পাস, ইথার প্রভৃতির কার্যক্রম শুধু মানুষের জ্ঞান-বহির্ভূতই নয়, এ সকল জড় পদার্থের ভেতরে প্রাণের উন্মেষ অনুসন্ধানের বিষয়ে মহাবিশ্বের চরম সত্তার অন্বেষণে জড় বিজ্ঞানের ব্যর্থতার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। লেখক এ প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে জড় প্রকৃতির মূলে বিদ্যুৎ শক্তিরূপে যে মহীয়সী শক্তি বিদ্যমান রয়েছে তা জেমস জীনস (১৮৭৭-১৯৪৬), আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫), আর্থার এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪) প্রমুখ মনীষীগণের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন, যাতে বলা হয়েছে, "অত্যাধুনিক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিস্কারসমূহের ফলে আমরা জড় জগতের পশ্চাতে যে বিরাট চেতনা শক্তির সাক্ষাৎ পাইতেছি, এই বিশ্ব হয়ত বস্তুরূপে সেই চেতনা শক্তিরই মূর্ত্তপ্রকাশ।"[৫১] এই বিশ্বসৃষ্টির অনন্ত রহস্য সম্পর্কে লেখকের মনে যে প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে, তার মীমাংসা "কিয়ামতের পূর্ব্বে মিলিবে বলিয়া মনে হয় না ।"[৫২] কারণ হিসেবে লেখক বলেন "মানুষের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি এখানে ঝিমাইয়া আসে, বিজ্ঞানের ক্লান্ত পাখা আপনি গুটাইয়া আসে।"[৫৩]

এ সকল বক্তব্য পর্যালোচনার মাধ্যমে লেখকের চৈতন্যবাদ মনোভাবের পরিচয় মেলে।

বিজ্ঞানযুগে ধর্ম ও সভ্যতা

ধর্মীয় অনুভুতি ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সমর্থক বরকতুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রগতিবিমুখ ছিলেন না। সমকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তথা বিরাজমান বিশ্বপরিস্থিতি পর্যালোচনায় তাঁর প্রগতিশীল ধর্মানুভূতি ও মানসিক প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। *বিজ্ঞান যুগে ধর্ম ও সভ্যতা* লেখকের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে নাস্তিকতার প্রসার, কালমার্কস ও নয়া

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিধান, যান্ত্রিক সভ্যতা ও উহার প্রতিক্রিয়া ও সভ্যতাকে সম্ভাব্য ধ্বংসের হাত হতে রক্ষার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বরকতুল্লাহর মতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের মাঝে নাস্তিকতা স্থান লাভ করেছে। যার প্রেক্ষিতে সূর্য এবং মহাবিশ্বের গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে মানুষের পূর্বের ধারণার সাথে সংঘাত দেখা দিয়েছে।[৫৪] লেখক মহাবিশ্ব এবং পরমাণু সম্পর্কে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ উপলব্ধি করেন। বৈজ্ঞানিকরা মহাকাশে বেহেশত দোজখের অস্তিত্ব যেমন খুঁজে পান না তেমনি মহাবিশ্বের সকল কার্যক্রম মহান সৃষ্টিকর্তার অমোঘ বিধান দ্বারা পরিচালিত তা বিশ্বাসেও বিরোধ রয়েছে বৈজ্ঞানিকদের। লেখকের মতে, এ যুগের আলোকিত মানুষ পরলোকে আর বিশ্বাস করিতে চায় না। বিধাতার বিচার ভয়ে কেহ আর অন্যায় হতে বিরত থাকিতে চায় না।[৫৫]

লেখকের মতে, বিজ্ঞান ধর্মের উপর যে পরিমাণ আক্রমণ করেছে তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করেছে সমাজ বিপ্লবীরা।[৫৬] কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)-এর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে প্রচলিত ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ায় লেখক গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কার্ল মার্কস এর মতে, সভ্যতার আসল ভিত্তি অর্থনীতি, ধর্ম মৌলিক বিষয় নয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, মজলুমের আর্তনাদ ও সামাজিক বৈষম্য দূর করতে ধর্ম যাজকেরা হাজার হাজার বৎসর উপদেশ ও বক্তৃতা করে ব্যর্থ হয়েছে। একটি মাত্র উপায়ে তা হলো সমাজ হতে আর্থিক বৈষম্যের আমূল বিলুপ্তি।[৫৭] সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ নাস্তিক্য প্রচার করায় লেখক এ মতবাদকে বিপজ্জনক ও পরিত্যাজ্য মনে করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে কোনো ধর্মীয় শক্তির অনুকম্পায় নয়, মানুষ নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তার দুঃখ দুর্দশা ঘোচাতে পারে। মানব কল্যাণের পক্ষে ধর্ম শুধু অনাবশ্যকই নয় অনিষ্টকরও বটে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের নেশা টানিয়া আনে মানবজীবনে নিগ্রহ, দারিদ্র ও কলহ। কার্ল মার্কস এর মতে অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার মাধ্যমেই সামাজিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি সাধন এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণ হলো

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই নিজ শ্রমের বিনিময়ে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সম্পদের এক ন্যায্য অংশ ভোগ করবে।

কার্ল মার্কস প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্তির ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই সমাজ বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে বরকতুল্লাহ প্রশ্ন করেন, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার কোনো দাম নেই, যেখানে মানুষ মাত্রই রাষ্ট্রের মজুর, সেখানে স্নেহ, মায়া-প্রীতি, মহত্ব ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী বিকাশের সুযোগ কোথায় ? বরকতুল্লাহর মতে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য পৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান। এ অবস্থায় ধর্ম-কর্ম বাদ দিয়ে মানুষকে শ্রম নির্ভর করে শ্রেণী বিরোধ দূর করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে কার্ল মার্কস প্রণীত অর্থব্যবস্থার চেয়ে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সুষ্ঠু ধন বন্টন দ্বারা ধনী ও দরিদ্রের ভিতর অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং এভাবে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীকে সমাজের এক মধ্যস্তরে সংস্থাপনের ইসলামী নীতিই অধিকতর শ্রেয়।[৫৮] বরকতুল্লাহর মতে ধর্মের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের অসংখ্য অভিযোগ থাকতে পারে। তবে সামাজিক অবিচার ও পাপাচারের জন্য দায়ী হল সে সকল ব্যক্তি যারা ধর্মকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করছে , ধর্মের নামে ধর্মতন্ত্র কায়েম করে অসহায় মানুষকে শোষণ করছে। এ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজন সমাজে ধর্মীয় বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সামাজিক বৈষম্য ও শোষণ-নির্যাতন দমন করা সম্ভব নয়। লেখকের মতে ধর্মের মূলনীতির সাথে কোন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের মৌলিক বিরোধ থাকতে পারে না। ধর্মের ব্যবহারিক পরিণতি সম্পর্কে সমস্যা হতে পারে। অবাঞ্ছিত প্রয়োগের ফলে উহার পরিণতি বিষময় হতে পারে। এই সম্বন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন, "ধর্ম বলে, যে যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক, পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ 'ব্রাহ্মণ' সে যতবড় অভাজনই হউক, অপরের মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ যুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক উভয় সমাজকে লেখক ভোগবাদী ও নীতিহীন বলেছেন। লেখকের মতে, এ দুই মতবাদ মানব সভ্যতায় ধ্বংস ডেকে আনবে। যন্ত্রযুগের সভ্যতাই এর জন্য দায়ী বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে সমাজতান্ত্রিক ও পুজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যন্ত্রসভ্যতারই ফল। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানব কল্যাণের বৈশিষ্ট্যগুলোও লেখক অনুধাবন করতে পারেন ৰি। এর কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি লেখকের ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি প্রবণতা। নৈতিকতা ও ধর্মীয় নীতিবোধমালা অনুসরণের মাধ্যমেই এ অবস্থা থেকে মানবজাতি পরিত্রাণ পেতে পারে বলে লেখকের অভিমত। লেখক পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার অমৃত বাণীই মানবজাতির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে বিশ্বাস করেন। পাশ্চাত্যের জড়বাদী উপাসকদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "...পাশ্চাত্যের জড়োপাসকগণ ঐহিক সুখ সমৃদ্ধির অন্বেষণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কাটাকাটি করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িবে তখন তাহারা প্রাচ্যের নিকট আসবে শান্তির সন্ধান লইতে। পাশ্চাত্য আমাদিগকে অনেককিছু শিক্ষা দিয়াছে কিন্তু আমাদেরও কিছু শিখাইবার আছে, -সে হইতেছে আধ্যাত্মিকতার অমৃত বাণী।"[৬০] এ সম্পর্কে বরকতুল্লাহ মনীষী ডঃ আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। ইকবালের মতে, "যে জাতি দেহের ক্ষুধা মিটানের জন্য কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত, তাহারা আত্মার ক্ষুধা বিস্মৃত হয় এবং মানবতার সেখানে ঘটে মৃত্যু।"[৬১]

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে যে পার্থক্য নিরুপণ করেছেন তাতে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। যন্ত্রসভ্যতাকে লেখক ধর্মের বিপরীতে দাঁড় করেছেন। এখানে প্রশ্ন আসে যন্ত্রসভ্যতা ও কার্ল মার্কস প্রণীত সমাজব্যবস্থার জন্যই কি বর্তমানে মানব সভ্যতার নৈতিক অধপতনের সৃষ্টি হয়েছে? কার্ল মার্কসের মতাদর্শে ধর্ম ও সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব ৰিপন্ন হওয়াতেই কি মানব সভ্যতার এই নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে? এই সংকট সৃষ্টিতে আর কোন বিষয় কি দায়ী নয়? এ সকল সংকট নিরসন কল্পে লেখক সত্যিকার ধর্ম ও নীতিবোধের বাস্তবায়ন চেয়েছেন। কিন্তু এই সত্যিকার ধর্মের স্বরূপ কি হবে সে সম্পর্কে লেখক বিশ্লেষণ করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য লেখক এক্ষেত্রে প্রাচ্যে প্রবর্তিত প্রত্যাদিষ্ট ধর্মকেই সত্যিকার ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পারমার্থিক জগৎ ও জীবন

পারমার্থিক জগৎ ও জীবন প্রবন্ধটি *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার সাথে মানব মনের সম্পর্ক, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক, আত্মা অবিনশ্বর কিনা প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

বরকতুল্লাহ বলেন, "এমন দিন বেশী দূরে নয় যখন বিজ্ঞানীরা আল্লা'র সম্পর্কে আরও নিবিড়তর জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন এবং অকুন্ট চিত্তে তাহার নিকট আত্মনিবেদন করিবেন।"[৬২] লেখকের মতে বিশ্বমনের সঙ্গে মানবমনের নিবিড় যোগাযোগ ও বিশ্বমন হতে প্রেরণার ফলেই মহাপুরুষদের দৃষ্টি এমন অন্তর্ভেদী এবং তাহাদের মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা অলৌকিক কার্যাবলী সাধিত হয়। এ সম্পর্কে লেখক বলেন, "দরিদ্রা মরিয়মের নিঃসহায় সন্তান ঈসা (আঃ) অথবা নিরীহ আবদুল্লা'র পুত্র উম্মী মুহম্মদ (দঃ) যদি জীবনে বিশ্বমনের পরশপাথর দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইতেন তবে অর্ধ পৃথিবীর মানুষ এমন করিয়া তাঁহাদের নির্দেশ মানিয়া চলিতনা।"[৬৩]

বিশ্ব আত্মা ও মানবাত্মা সকল ধর্মে ভিন্ন নামে হলেও অবিনশ্বররূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। লেখকের মতে মনের সঙ্গে আত্মার গভীর সম্পর্ক রয়েছে, আত্মাই জীবনের মূল উৎস এবং আত্মা থেকেই আসে মানুষের সকল কর্ম প্রেরণা। মানবাত্মা ও বিশ্ব আত্মার স্বীকৃতি ও অবিনশ্বরত্বকে অবলম্বন করেই সকল ধর্ম বহাল রয়েছে। তিনি ধর্মকে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। লেখক আত্মাকে জীবনের মূল উৎস ও মানুষের সকল কর্ম প্রেরণার উৎস বলে গণ্য করেছেন। পরকালে আত্মা দেহসহ আর্বিভাব করবে ও কর্মফল ভোগ করবে এবং সেই সব কর্মফল ভোগের জন্য কোন অক্ষয় লোকে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। লেখকের মতে মানব সভ্যতার শুরু হতেই বর্তমান সময় পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ সংসার, সুখ-শান্তি ও প্রিয়জনের মায়া মমতা ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে

Dhaka University Institutional Repository

পর্বত গুহায়, মসজিদ-মন্দিরে ধ্যানমগ্ন থেকেছে বিশ্বআত্মার সাথে সেতুবন্ধন স্থাপন করার জন্য। তাই বলা যায় আত্মা অলীক কিছু নয় বা ঐ সকল সাধু পুরুষরাও বিকৃত মস্তিষ্কের নয়। বরং দেখা যায় ধর্মীয় জীবন হতে মানুষ যতই স্খলিত হয় সমাজে অপ্রকৃতিস্থদের সংখ্যা ততই বেড়ে যায় । খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মে রুহের অবিনশ্বর সত্তায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মে মৃত্যু হল রুহের গৃহত্যাগ আর দেহ উহার সাময়িক আবাস। এভাবে লেখক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক আলোচ্য প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বপক্ষে কয়েকটি আত্মা দর্শনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা তুলে ধরেছেন। লেখক প্রথমে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 'প্লানচেট' প্রক্রিয়ার কথা তুলে ধরেছেন। এ প্রক্রিয়ায় শুদ্ধশান্ত চিত্তে কোন পুতপবিত্র লোক ধ্যানরত অবস্থায় কোন মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ডাকলে 'প্লানচেটে' তার সাড়া মিলে, এরূপ বহু কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় বলে লেখক উল্লেখ করেছেন।

লেখক হিন্দু যোগশাস্ত্রের প্রাণায়াম ও মুসলিম সাধকদের 'মোরাকাবা' প্রসংগে বলেন,

> হিন্দু যোগশাস্ত্রে উল্লেখিত 'প্রাণায়াম' প্রক্রিয়ায়, শুনা যায়, জীবিত মানুষের আত্মা স্বল্পকালের জন্য দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া অন্যত্র প্রয়াণ করিতে এবং তথাকার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া পুনরায় নিজ দেহে ফিরিয়া আসিতে পারে। যতক্ষণ আত্মা বহিঃপ্রয়াণ করে, ততক্ষণ উহার পরিত্যক্ত দেহটী মৃতবৎ নিশ্চল থাকে। ঐ অবস্থায় কাহারও উহা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।"[৬৪]

"মুসলিম সাধকেরাও মোরাকাবা (ধ্যান) অবস্থায় কখনও কখনও পরলোকগত আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন বলিয়া বর্ণিত আছে।"[৬৫]

বরকতুল্লাহ আত্মা দর্শনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা তুলে ধরে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টি রেখে পারমার্থিক জীবনের সন্ধান করেছেন তবে অধিকাংশ স্থলেই লেখক দর্শনের যুক্তির পথে স্থির থাকতে পারেন নি। এ প্রবন্ধে লেখক মূলত প্রচলিত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আত্মার কথা বলেছেন। লেখক *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থে দর্শন আলোচনায় কখনও যুক্তিবুদ্ধির পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং মাঝে মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসে অগ্রসর হয়েছেন। বরকতুল্লাহর দর্শন চিন্তা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক আবদুল হকের বক্তব্য হলো,

> ক. সাধারণভাবে দর্শন-আলোচনার মাঝখানে এরূপ বিশেষ ধর্ম- বিশ্বাসের অবতারণা সঙ্গত হয়েছে বলা কঠিন, কেননা দর্শনের যুক্তি নিয়ে তর্ক চলে, ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে চলে না।[৬৬]
>
> খ.পদার্থ বিজ্ঞানীরা কিন্তু এমন কথা বলেন না, এবং বিজ্ঞানকে লঙ্ঘন করে দর্শন দাঁড়াতে পারে কেমন করে বোঝা কঠিন।[৬৭]
>
> গ. এরূপ উক্তি শুধু অদার্শনিক নয়, এটা কোনো যুক্তিই নয়। এরূপ উক্তির ফলে বরকতুল্লাহ সাহেবের চৈতন্যবাদ ধূলিস্যাৎ হয়েছে।[৬৮]
>
> ঘ. দর্শনালোচনা আরম্ভ করে এইভাবে তিনি কার্যতঃ দর্শনকে বর্জন করেছেন কেননা দর্শনের প্রধান কথা যুক্তি-প্রমাণ।[৬৯]
>
> ঙ. লেখক হিসেবে রহস্যবাদের বাইরে দর্শনের আর কোনো চর্চাই তিনি করেন নি।[৭০]

আবদুল হক দর্শনিক বিচারে বরকতুল্লাহকে 'অদ্বৈতবাদী, চৈতন্যবাদী, অজ্ঞেয়বাদী এবং মরমিয়াবাদী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল হকের এ মূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ হলেও দর্শনবিদ আমিনুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে একমত পোষণ করেন নি। দর্শনবিদ আমিনুল ইসলামের মতে, "চিন্তার ক্ষেত্রে বরকতুল্লাহ 'মরমিয়াবাদী' আবদুল হকের এ কথা মেনে নিলেও তিনি বিজ্ঞান বিরোধী ছিলেন এ কথা বলা যায় না। কারণ বরকতুল্লাহ বিজ্ঞানকে

Dhaka University Institutional Repository

বিসর্জন দেন নি, বিজ্ঞানের প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন অকপটে।"[৭১] বরকতুল্লাহর দার্শনিক চিন্তাধারায় ভাববাদী ও অধ্যাত্ববাদী প্রতিফলন সম্পর্কে দর্শনবিদ আমিনুল ইসলাম *মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দার্শনিক চিন্তা* শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "বরকতুল্লাহ 'বিশ্বময় প্রেরণা' সনাতন সত্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাঁর ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী মনোবৃত্তির পরিচয় সুস্পষ্ট, এবং একই সঙ্গে তাতে আবার অভিব্যক্ত হয়েছে প্রচলিত ধর্মানুভূতি ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থা।"[৭২] একই প্রবন্ধে আমিনুল ইসলাম বলেছেন, "ধর্মভাবাপন্ন মানসিকতা তাঁকে বিজ্ঞানবিমুখ কিংবা প্রগতি বিরোধী করে নি, করতে পারে নি।"[৭৩] এ প্রসঙ্গে সমালোচক হাবিবুর রহমানের বক্তব্য হলো- "তাঁর দর্শন আলোচনা সর্বদা ও সর্বথা যৌক্তিক হতে পারে নি। এমনকি অনেক সময় স্ববিরোধী উক্তিও তিনি করেছেন। তবে একথা বলা যাবে পারতপক্ষে তিনি যুক্তিকে অস্বীকার করতে চান নি।"[৭৪]

মানুষের ধর্ম্ম ছাড়াও *পারস্য প্রতিভা* প্রবন্ধে বরকতুল্লাহর দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। দশম ও ত্রয়োদশ শতাব্দে পারস্যে দর্শন চর্চার যে জাগরণ দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে লেখক *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থের ভূমিকা এবং ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭) ও আল্ গাজ্জালি (রাঃ) এর (১০৫৮-১১১১) জীবনদর্শন আলোচনায় বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এক সময়ের জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল দামেস্ক ও বাগদাদ বৈদেশিক আগ্রাসন হতে মুক্ত হওয়ার পর স্বাধীন পারস্যে দর্শনচর্চার এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময়ে পারস্যের মনীষী ও দার্শনিকরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় আরবের যুক্তিবাদী দর্শন, গ্রীস ও মিসরের নিওপ্লেটনিক ভাবধারা, সুফীবাদের চিন্তাধারা এবং ভারতীয় উপনিষদের বাণী দ্বারা। এ ছাড়াও লেখক এ সকল দর্শনের সাথে অষ্টম শতাব্দে সিরিয়ায় উদ্ভূত মুতাঝিলা দর্শনের যোগসূত্র খুঁজেছেন। অদৃষ্টবাদকে কেন্দ্র করে মুতাঝিলাদের উদ্ভব ঘটে। মুতাঝিলাগণ মানুষের কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তারা মানুষের কর্মকে নিয়তির নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মানতেন না। তারা প্লেটো (খ্রিঃপূঃ ৪২৭-৩৪৭) ও অ্যারিস্টটলের (খ্রিঃপূঃ ৩৮৪-৩২২) দর্শন এবং কোরআনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। আল্লাহর একত্ববাদ, তার সত্ত্বা, কোরআনের চিরন্তনত্ব নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মুতাঝিলাদের মতাদর্শ তৎকালীন আরব পারস্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করে। আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনামলে মুতাঝিলা দর্শন ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় যে সকল মুসলিম মনীষীর নাম উল্লেখযোগ্য তারা হলেন- আলকিন্দি (৮০০-৮৭০), আল ফারাবি (৮৭৩-৯৫০), ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭), আল্ গাজ্জালী (১০৫৮-১১১১) ওমর খইয়াম (১০৭৫-১১২৪), ইবনে রাজা (মৃত্যু-১১৩৪), ইবনে তোফায়েল (১১০০-১১৮৫), ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৯) প্রমুখ।

বরকতুল্লাহর মতে ইবনে সিনা দর্শনের গরল বাদ দিয়ে শুধু সুধা গ্রহণ করেছেন। ইবনে সিনা ধর্ম ও দর্শনকে পৃথক হিসেবে দেখতেন এবং এ দুয়ের সমন্বয়কে অসম্ভব মনে করতেন। কেননা তাঁর মতে,

> 'ধর্মের ভিত্তি হইতেছে বিশ্বাস (Faith), আর দর্শনের ভিত্তি বিচার-বুদ্ধি (Reason)। এ দুই এর ভিতর ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা তাঁর মতে পন্ডশ্রম মাত্র। দর্শনের কাজ হইল বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ ও জীবনের চরম সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও সমাধান করা। ধর্ম শাস্ত্রের কাজ হইল মনুষ্য বুদ্ধির অতীত ও অজ্ঞেয় কতকগুলি মৌলিক সূত্রকে ভিত্তি করিয়া, মানুষের অন্তরকে এক চির রহস্যাচ্ছন্ন অজানা জগতের দিকে উন্মুখ করা এবং দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্যকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মবেত্তার পক্ষে যুক্তিবাদী দার্শনিকের নিকট পোষকতার আকাঙ্ক্ষা করা যেমন অযৌক্তিক, দার্শনিকের পক্ষেও তাঁহার ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকা অবস্থায় অতীন্দ্রিয় জগতের গূঢ় বিষয় সমূহের ভিতর নাসিকা গলান তেমনি অনধিকার চর্চা।'[৭৫]

ইবনে সিনা দর্শনকে তিনটি শাখায় বিভক্ত করেছেন, ১. লজিক (তর্কশাস্ত্র), ২. বস্তু বিজ্ঞান (Physics) ও ৩.আদি-দর্শন (Metaphysics)। তাঁর মতে, বস্তু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উপর। বাহ্য জগতকে কেন্দ্র করে তার কার্যক্রম চলে। তাঁর মতে আদি

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন ছাড়া পূর্ণজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। ইবনে সিনা মন ও দেহকে দু'টি স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে স্বীকার করেছেন।

তাঁর মতে মন আত্মারই সক্রিয় প্রকাশ। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ আত্মা থেকেই প্রাপ্ত। আত্মা ব্যতিত মানুষ জড়পিন্ড ছাড়া কিছুই নয়। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষের আত্মাকে তিনি মানসিকতার ক্রমবিকাশের তারতম্য অনুসারে আত্মাসমূহের বিভিন্ন পর্যায় বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে সিনার মতে আত্মা বিবিধ কর্মশক্তির সমাহার। পরস্পর বিচ্ছিন্ন আত্মাগুলি নিজের অগোচরে বিশ্ব আত্মার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। বিশ্ব আত্মাই এদের উৎস। দার্শনিক আল ফারাবী বিশ্ব আত্মা হতে জড়সত্ত্বার উদ্ভব বলে মনে করেন এবং বস্তু জগতের সবকিছুতেই বিশ্ব আত্মার প্রকাশ ধারণা করে প্যানথিজমের সূত্রপাত করেন। ইবনে সিনার মতে বিশ্ব আত্মা এক নিরেট আত্মিক সত্ত্বা, সমস্ত জড় সত্ত্বার উর্ধ্বে উহার স্থান। ইবনে সিনা বিশ্বের সত্ত্বা সমূহকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন- (১) সম্ভাব্য সত্ত্বা (Possible existence) এবং (২) আবশ্যিক সত্ত্বা (Necessary existence)। তাঁর মতে সম্ভাব্য সত্ত্বা হলো যাহা নিজ বিকাশের জন্য অন্যের সাপেক্ষ। অপরপক্ষে আবশ্যিক সত্ত্বা হলো সর্বতোভাবে অপর নিরপেক্ষ এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বিশ্ব আত্মাই একমাত্র আবশ্যিক সত্ত্বা। অন্য সব কিছুই সম্ভাব্য সত্ত্বা।[৭৬]

মেটাফিজিক্স থেকেই মানুষের পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় ইবনে সিনার এ মতের সাথে বরকতুল্লাহ একমত পোষণ করেন। দেহের সঙ্গে মনের কোন সম্পর্ক নেই। মন আত্মারই সক্রিয় প্রকাশ। দেহ হতে আত্মার বিচ্ছেদ হলেই মানবাত্মা বিশ্বআত্মার সান্নিধ্যে গিয়ে স্বতন্ত্ররূপে বিরাজ করে। সুফিবাদের যে ত্যাগধর্মী অধ্যাত্মসাধনা তার মধ্যে লেখকমানব মুক্তির সন্ধান পান। অপরদিকে লেখক ইবনে রুশদের সার্বজনীন ধর্মমতেরও সমর্থক, যেখানে সংকীর্ণতা ত্যাগ করে বলা হয়েছে, সত্য সকল ধর্মেই এক, বিরোধ শুধু রূপ নিয়ে। কিন্ত মানবতার সাধনা হচ্ছে সত্যের সাধনা। বরকতুল্লাহ তাঁর দর্শন আলোচনায় এই মানবতার সাধনার দিকেই মানব সভ্যতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইবনে রুশদের দার্শনিক মত ইউরোপে এভিরোইজম নামে

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত। ইবনে রুশদের মতে বিজ্ঞান বা দর্শন ধর্মের অন্তর্ভূক্ত নয়। প্রত্যেক শাস্ত্রেরই নির্দিষ্ট গণ্ডি রয়েছে। ধর্ম, দর্শন বা বিজ্ঞানশাস্ত্র একে অপরের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। ইসলামের জ্ঞান সাধনায় ইবনে রুশদের অন্যতম অবদান হচ্ছে শাস্ত্রের এলাকা হতে দর্শন ও বিজ্ঞানের পৃথক অবস্থান নির্দেশ।

ইসলাম-বহির্ভূত পারস্যের অবতারবাদ ও একত্ববাদ সংক্রান্ত বিষয়ের সংস্রবে এসে সুফিবাদের জন্ম হয়। বরকতুল্লাহর মতে আরবেরা সেমেটিক সম্প্রদায়ভূক্ত যার প্রবণতা বহির্মুখীন, অপরদিকে আর্য সম্প্রদায়ভূক্ত পারস্যবাসীদের চিন্তাধারা ছিল অন্তর্মুখীন। পারস্যবাসীরা ছিল ভাববাদী এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে পারস্যবাসীরা ছিল একত্ববাদী। অপরদিকে সেমেটিক সম্প্রদায়ভুক্ত আরবদের প্রবণতা বহির্মুখীন। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে আরবেরা দ্বৈতবাদী। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন কল্পনা সুফি মতবাদের মেরুদণ্ডস্বরূপ। সুফি মতাদর্শ প্রথমে ইসলামের স্বীকৃতি পায় নাই। ইমাম আল্ গাজ্জালি (রাঃ) সুফি মতবাদের যৌক্তিকতা তুলে ধরার পর তা ইসলামের সৌষ্ঠবে পরিণত হয়। গাজ্জালি (রাঃ) দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেও ধর্মের ব্যাপারে দর্শনের হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। দর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেও তিনি দর্শনকে ধর্মের নিচে স্থান দেন। তিনি শরিয়ত ও মারেফতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সুফি মতকে ইসলামের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁর মতে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) শুধু শরিয়তের প্রবর্তকই নন- তিনি সকল পীরের আদি পীর। তাই তাঁর প্রবর্তিত শরিয়তের বিধান, যার উৎস কোরআন তা সকলেন জন্য পালনীয়। এ জন্যই সুফিবাদীদের শরিয়ত অনুসরণ করতে হবে ও সংসার ধর্ম পালন করতে হবে। তারা প্রকাশ্যে হবে সংসারী কিন্ত অন্তরে হবে ফকির। বরকতুল্লাহ এ প্রসঙ্গে সুফিমতের সঙ্গে বৈষ্ণধর্ম, বেদান্ত, উপনিষদ, নিওপ্লেটনিজম, শঙ্কর ও রামানুজের মতাদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। লেখক ইসলামের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ বদরের একটি ঘটনা উল্লেখ করে পবিত্র কোরআন থেকে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। "কথিত আছে, বদরের যুদ্ধে হযরত কাফিরগণের উপর জয়লাভ করিলে তাঁহার সঙ্গীয় যোদ্ধাগণ যখন জ্ঞাতিবধজনিত শোকে অধীর হইয়াছিলেন তখন নিম্নলিখিত আয়াত নাযেল হয়, "তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, আল্লাহই তাহাদিগকে

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা করিয়াছেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং ইহা মু'মিনগণকে আল্লাহর পক্ষ হইতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৭৭] এ সম্পর্কে বরকতুল্লাহ বলেন,

> এই বাক্যে ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে আল্লা'ই সকল কার্যের কর্তা (ফায়েল মৎলক) এবং মানুষ তাঁহার হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র। লেখনি যেমন সকল বর্ণ ও শব্দ প্রস্তুত করিলেও লেখেকের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয়, তাহার নিজের কোন স্বাধীনতা নাই, আল্লাহর হস্তে মানুষও তেমনি। কুরআনের এই শিক্ষা ও ঋষি বদরায়নের উপনিষদের ব্রহ্মসূত্রের ভিতর কি সুন্দর ঐক্য রহিয়াছে! ব্রহ্মসূত্র যেমন গৌড় পাদ ও শঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছিল, কুরআণও তেমনি বুমী, জা'মী ও হাফিযের আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল।[৭৮]

এ সব আলোচনায় বরকতুল্লাহর উদার ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখক পারস্য প্রতিভা গ্রন্থের ভূমিকায় শিয়া মুসলিমদের ইসমাইলি মতাদর্শ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আরব ও পারস্যের ইসলামি দার্শনিকদের চিন্তাধারা সম্পর্কে লেখক পারস্য প্রতিভা গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ সকল আলোচনার সূত্রেই তাঁকে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তধারা, নিওপ্লেটনিজম, ইবনে রুশদের দর্শন চিন্তা, ভারতবর্ষের উপনিষদ, বেদান্ত, বৈষ্ণধর্ম, শঙ্কর-রামানুজ প্রমুখের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা করতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বরকতুল্লাহর দার্শনিক প্রজ্ঞার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি তাঁর উদার ও সংস্কারমুক্ত সুন্দর মনের পরিচয় ফুটে উঠে। সেই সাথে তাঁর ভাববাদী, অধ্যাত্মবাদী ও মরমিয়াবাদী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

মরমীয়াবাদী বরকতুল্লাহ ব্যক্তির আত্মিক মুক্তির সাধনাকেই একান্ত ও পরম বলে অভিহিত করেছেন। যদিও তিনি কখনও কখনও ব্যক্তির বৃহত্তর সত্ত্বা সমাজের মঙ্গলের কথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাব সাধনার দ্বারা বৃহত্তর সামাজিক মঙ্গল সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক সচেতনতা।[৭৯]

অ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তধারা বিজ্ঞানভিত্তিক হলেও তিনি আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। প্লেটোর মত বাস্তব জগতকে তিনি অলীক বলেন নি। জড়জগৎ সত্য হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন। এ জগৎকে সৃষ্টি করেছে এক অশরীরী নির্মল আত্মা। যে আত্মার শক্তি হচ্ছে তার ইচ্ছা। অ্যারিস্টটলের এ দর্শন আরব ও পারস্য সাম্রাজ্যে মুক্ত বুদ্ধির বিকাশে ব্যাপক অবদান রাখে। এ সময়ে পরকালের অস্তিত্ব ও মানুষের কর্মফলের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ দ্বিধা সংশয়ে ভোগছিল।

কখনও কখনও বরকতুল্লাহর ধর্মীয় অনুভূতি তাঁকে প্রচলিত ও পূর্বপোষিত ধারণা দ্বারা চালিত করলেও তিনি গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনচিন্তা দুটোই ছিল মানব কল্যাণমূখী। আর তাই তিনি সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ধর্মকে বিচার করার প্রয়োজন বোধ করেছেন।[৮০]

বরকতুল্লাহ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয়েও তিনি জীবন বিবিক্ত দর্শন চিন্তায় প্ররোচিত হন নি। এ প্রসঙ্গে হরিদাস ভট্টাচার্য্যের মন্তব্য তুলে ধরা হলো,

> তাঁহার জড়বাদের বিরুদ্ধে অভিযান ও অনুভূতির সাহায্যে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে মত বৈদান্তিক ও সুফী উভয়কেই আকৃষ্ট করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি মায়াবাদকে প্রশ্রয় দেন নাই- বরং প্রাকৃতিক জগতের যাহা কিছু গ্রহণীয়, করণীয় ও বরণীয় তাহাকে জীবনের উপভোগ, উপায় ও উদ্দেশ্য বস্তু হিসাবে ব্যবহার করিতে লেখক আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন।[৮১]

Dhaka University Institutional Repository

বরকতুল্লাহর দর্শনভাবনায় মানুষের বিকাশশীলতায় আস্তা রয়েছে, মুর্খতা বলে অভিহিত করেছেন বিজ্ঞান বিরোধীতাকে। তিনি বলেছেন, "ভবিষ্যতে মানুষ অপেক্ষা উন্নততর সৃষ্টি না হউক, অন্তত উন্নততর জ্ঞান-সম্পন্ন মানব যে জন্ম গ্রহণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"[৮২]

বিজ্ঞান সম্পর্কে বরকতুল্লাহ বলেন,

> বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুখিতে চাওয়া চরম মূর্খতা। উন্নতির সেইধারা অব্যাহত রাখিয়া, কি করিয়া সেই সঙ্গে ধর্ম্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অগ্রগতির সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, তাহাই হইল এই সঙ্কট মুহূর্ত্তের প্রধান প্রশ্ন। বিজ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে শাণিত করে এবং বুদ্ধির স্তরে জ্ঞান-রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করে, কিন্তু মনের যে আরও একটা দিক আছে, সেদিক দিয়া মন বিকাশ অভাবে বিকলাঙ্গ হইয়া পরে। নীতি ও কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ হইয়া আসে। করণ উহার মূলে কোনও প্রাণবন্ত প্রেরণা থাকে না। শুধু কৃত্রিম একটা সৌজন্যের মুখোশ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় মাত্র।[৮৩]

লেখক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বলেন মানুষের অন্তর গঠনে বিজ্ঞান ভূমিকা রাখতে পারে না, ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ-ই এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এ জন্যই তিনি বিজ্ঞানের উন্নতির ধারার সঙ্গে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সামঞ্জস্য চেয়েছেন। বরকতুল্লাহর মতে এর মাধ্যমেই মানুষ আপনার সত্যকার রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তাঁর মতে এই 'সত্যকার রূপ'ই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। বরকতুল্লাহর দর্শনচিন্তার মৌলিক মর্ম-এখানেই নিহিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১. 'প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী' বরকতুল্লাহর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১১-১২

২. জীবন কথা, মোহম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬

৪. (সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়) 'মোহম্মদ বরকতুল্লাহ', সাহিত্য সমীক্ষা, মুক্তধারা, ১৯৭৬, পৃ. ১৭৯

৫. মাসিক মোহাম্মদীর বৈশাখ ১৩৪২ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, "বরকতুল্লাহ সাহেব একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক । এদিক দিয়ে তিনি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য-বোধ হয় অদ্বিতীয়ও । বরকতুল্লাহ (১ম খণ্ড), পৃ. ৪১৩ । এ মন্তব্য আজও সত্য ।

৬. বরকতুল্লাহ রচনাবলী (১ম খণ্ড) পৃ. ৪১৩

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

৮. মোহম্মদ আবদুল কাউয়ুম সম্পাদিত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ২৮৩

৯. মোহম্মদ নাসির উদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, প্রকাশিতঃ নূরজাহান বেগম, ১৯৭৫, পৃ. ১৫২৩

১০. আবদুল হক, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ঃ দর্শনচর্চা, নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ পৃ. ১০৫

১১. আমিনুল ইসলাম, 'বরকতুল্লাহ', জগৎ জীবন দর্শন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৩৫৪

১২. 'অনন্ত তৃষা', মানুষের ধর্ম্ম, বরকতুল্লাহ (১ম খণ্ড), পৃ. ২৮৫

১৩. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৮৬

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

১৫. 'ধ্রুব কোথায়', ঐ. পৃ. ৩০২-৩০৩

১৬. 'চৈতন্যবাদ', ঐ. পৃ. ৩৪০

১৭. 'আদিম প্রেরণা', ঐ. পৃ. ২৯৩

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

১৯. 'জীবন ও নীতি', মানুষের ধর্ম্ম, বরকতুল্লাহ (১ম খণ্ড), পৃ. ২৯৭

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

২৩. মানুষের ধর্ম্ম, বরকতুল্লাহ (১ম খণ্ড), পৃ. ৩০২

২৪. 'ধ্রুব কোথায়', মানুষের ধর্ম্ম, বরকতুল্লাহ (১ম খণ্ড), পৃ. ৩০৩

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

৩১. প্লেটোর অতীন্দ্রিয় জগত, বরকতুল্লাহ, মানুষের ধর্ম্ম (১ম খণ্ড), পৃ. ৩১৪

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

৩৩. জড়বাদ, বরকতুল্লাহ, মানুষের ধর্ম্ম, (১ম খণ্ড), ৩১৮

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

৩৫. চৈতন্যবাদ, ঐ, পৃ. ৩৩৭

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৪১. বস্তুরূপ ও বস্তু, বরকতুল্লাহ, মানুষের ধর্ম্ম, (১ম খণ্ড), পৃ. ৩৫১

৪২. জীবন প্রবাহ, বরকতুল্লাহ, মানুষের ধর্ম্ম, (১ম খণ্ড) পৃ. ৩৬২

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

৪৮. আবদুল হক, নিঃসঙ্গ চেতনা অন্যান্য প্রসঙ্গ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৮৪) পৃ.১১০

৪৯. পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ, বরকতুল্লাহ, মানুষের ধর্ম্ম (১ম খণ্ড), পৃ. ৩৩৩

৫০. প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৩৩

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

৫৪. বিজ্ঞান যুগে ধর্ম ও সভ্যতা, বরকতুল্লাহ, মানুষের ধর্ম্ম (১ম খণ্ড)), পৃ. ৩৬৫

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

৬২. পারমার্থিক জগৎও জীবন, বরকতুল্লাহ, মানুষের ধর্ম্ম (১ম খণ্ড)), পৃ. ৩৭৭

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩

৬৬. আবদুল হক, মোহম্মদ বরকতুল্লাহঃ দর্শনচর্চা, নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১০৮

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৭১. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দার্শনিক চিন্তা, বাংলাদেশে দর্শনঃ ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৫২৮

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৯

৭৪. মোহম্মদ বরকতুল্লাহঃ জীবন ও সাহিত্য, হাবিবুর রহমান, একুশের প্রবন্ধ,১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯

৭৫. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, পারস্য প্রতিভা, (১ম খণ্ড), পৃ. ২৪৫

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৭৯. আবদুল হক, "মোহম্মদ বরকতুল্লাহঃ দর্শনচর্চা", নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ১১০

৮০. আমিনুল ইসলাম, 'বরকতুল্লাহ', জগৎ জীবন দর্শন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৩৫৫

৮১. ভূমিকা, মানুষের ধর্ম্ম,, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

৮২. জীবন ও নীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

৮৩. বিজ্ঞান যুগে ধর্ম ও সভ্যতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য চর্চা

অসাধারণ মেধাবী মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ছাত্র জীবনেই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের জন্য তার কষ্ট হতো। মুসলমানদের উন্নতির জন্য তিনি চিন্তা করতেন। তৎকালীন সময়েই বরকতুল্লাহ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত *আল-ইসলাম* পত্রিকায় *জাতীয়তাবাদ* সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেন। মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। কর্ম জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পরও তাঁর সাহিত্য পিপাসু মন নিষ্ঠা, সাহিত্যানুরাগ ও অদম্য নিরলস সাধনার জগতে বিচরণ করে আনন্দ পেত। মূলত তিনি ছিলেন ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একজন ভক্ত পাঠক ও লেখক। তাঁর দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ *মানুষের ধর্ম্ম* ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে এ বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর কৃতিত্বপূর্ণ জীবন তিনি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়ও তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জীবনী ও কারবালার ইতিহাসের উপর গ্রন্থ লিখেছেন। পারস্যের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক ও সাধকের কৃতিত্বপূর্ণ জীবন নিয়ে রচনা করেছেন *পারস্য প্রতিভা*। তাঁর রচনাবলীতে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়াবলী অন্ত র্ভূক্ত হলেও সেগুলোর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

নবী গৃহ সংবাদ

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ১৯৩৩-৩৪ সনে *মাসিক সওগাত* পত্রিকায় হযরত খাদিজা (রাঃ) সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কতগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধগুলো তৎকালীন পাঠক সমাজে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি প্রবন্ধগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য লেখককে অনুপ্রেরণা দেন। তাদের অনুপ্রেরণায় উক্ত প্রবন্ধগুলোকে ভিত্তি করেই *নবীগৃহ সংবাদ*

Dhaka University Institutional Repository

রচিত হয়। নবীগৃহ সংবাদ গ্রন্থটি ১৯৬০ সালে প্রকাশক মোহম্মদ আসাদুল্লাহ, গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ৩৪ বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ডিসেম্বর ১৯৮৩ ও নভেম্বর ১৯৮৮ সালে এ গ্রন্থের দুটি সংস্করণ প্রকাশ করে। হযরত খাদিজা (রাঃ) চরিত্র প্রসঙ্গে লেখক *নবী গৃহ সংবাদ* গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন, "নবী চরিত্র বাদ দিয়া প্রথমে খদিজা চরিত্র কেন লিখিয়াছিলাম, তার কারণ, -নবী চরিত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়, তথা বাংলা ভাষাতেও, অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কিন্তু খদিজা চরিত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা এ যাবৎ খুব অল্পই হইয়াছে।"[১]

নবী গৃহ সংবাদ যদিও নবী পত্নী বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত তবু গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র খাদিজা (রাঃ) চরিত্র কিংবা নবী গৃহের বিবরণই স্থান পায় নি। উক্ত গ্রন্থে আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব, আরবজাতির ইতিহাস, প্রাচীন সভ্যতা এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর শৈশবকাল থেকে শুরু করে মদীনায় হিযরতের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনাবলী আলোচিত হয়েছে। কেবল খাদিজা (রাঃ)-এর চরিত্র বা নবী গৃহের সংবাদের জন্য এ সকল আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। এ দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় গ্রন্থটির নামকরণ খুব যুক্তিযুক্ত হয় নি। বরকতুল্লাহর বক্তব্য থেকেও বিষয়টি পরিস্কার বোঝা যায়, "খদিজা চরিত্র অঙ্কিত করিলে নবী চরিত্র সে আলেখ্যে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে কেননা দুইটি চরিত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার নবী চরিত্রের অর্থই ইসলামের ক্রমবিকাশের কাহিনী। তাই নবী চরিত্রের সঙ্গে ইসলামের ক্রমবিকাশও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।"[২]

বরকতুল্লাহ *নবী গৃহ সংবাদ* গ্রন্থে খাদিজা (রাঃ)-এর চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইসলামের ক্রমবিকাশে খাদিজা (রাঃ)-এর অবদান, তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য, পতিভক্তি এবং আদর্শ গৃহিনী হিসেবে এই মহিয়সী নারী মানুষের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিবি খাদিজা (রাঃ) সম্পর্কে বরকতুল্লাহ বলেন, "বিভিন্ন জাতির যত নারী চরিত্র পাঠ করিয়াছি তার মধ্যে খদিজার চরিত্র আমার সব চাইতে ভাল লাগিয়াছে। এই মহিমময়ী রমণীর নির্মল চরিত্র,

Dhaka University Institutional Repository

প্রগাঢ় স্বামী ভক্তি ও অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ যে কোনও যুগে নারী সমাজের আদর্শ স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"[৩]

সমগ্র আরবদেশ যখন পাপ, মদ, জুয়া, সুদ, ব্যভিচারে আচ্ছন্ন, তখনও কতিপয় লোক সত্য, ন্যায় ও ধর্মের আলোকে আলোকিত ছিল। ধর্মের পথে তারা পাহাড়ের মত অবিচল ছিল। সত্য, সুন্দর আর ন্যায়-নীতির আলোকে তাদের হৃদয় উদ্ভাসিত ছিল। তৎকালীন সময়ে মক্কার এক প্রান্তে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের অবস্থান ছিল। এ পরিবারের প্রধান ছিলেন খোয়ালেদ। তিনি ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট ধনী এবং প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। এক বিশিষ্ট খৃষ্টান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন খোয়ালেদ। সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সততা ও ন্যায় পরায়ণতার জন্য তিনি মক্কা নগরীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। খোয়ালেদ-এর স্ত্রী যায়েদা ছিলেন অপরূপা সুন্দরী ও গুণবতী। স্রষ্টার উপর তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি নিয়মিত স্রষ্টার উপাসনা করতেন। খোয়ালেদের পূর্ব পুরুষগণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে বংশানুক্রমে তা পালন করে আসছে।[৪] এই খোয়ালেদ পরিবারেই ৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে খাদিজা (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। খাদিজা (রাঃ)-এর মাতা যায়েদা ছিলেন কুরায়েশ বংশীয়া। খাদিজা (রাঃ) পরম আদরে আর স্নেহ-যত্নে মা-বাবার হাতেই লালিত-পালিত হন। জন্মলগ্ন থেকেই খাদিজা (রাঃ) এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। শিশু বয়সে খাদিজা (রাঃ) অন্যান্য শিশুদের থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর হাসি-কান্না অন্যান্য শিশু থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল। তাঁর হাসি-কান্নাতেই যেন বিশেষ কি একটা মাধুর্য প্রকাশ পেত। সবাই তা দেখে বিস্মিত হত। তাঁর সুমিষ্ট ডাক ও কথা-বার্তায় সবাই পরম তুষ্ট হতেন। যে বয়সে অন্য শিশুরা খেলা-ধূলায় ব্যস্ত সে বয়সে খাদিজা (রাঃ) তার মায়ের কাছে বসে নীরবে প্রতিটি কাজ লক্ষ্য করে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতেন। অন্যান্য শিশুদের মতো হৈ-হুল্লোর করে খেলবার প্রবৃত্তি তার ছিল না। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই যেন কাজের, শিক্ষার, অভিজ্ঞতা অর্জনের। তাঁর বয়স যতই বাড়তে লাগলো ততই যেন একটা সুরুচি আর পবিত্রতার ছাপ প্রকাশ পেতে লাগলো। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাই তার নির্মল চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'তাহেরা' বা পবিত্র কন্যা বলে ডাকতো। খোয়ালেদ নিজে ছিলেন শিক্ষিত এবং জ্ঞানী। তিনি নিজেই খাদিজা (রাঃ)-কে

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন। মায়ের নিকটও শিশু খাদিজা (রাঃ) বৈষয়িক শিক্ষা লাভ করেন। পরিণত বয়সে যা দরকার হয়েছিল, মা-বাবার নিকট থেকেই খাদিজা (রাঃ) তা সংগ্রহ করে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। শিশু খাদিজা (রাঃ) পিতার নিকট হতে ইঞ্জিল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়াও শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণী আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে বহির্বিশ্বের জ্ঞানার্জন করেন। পুত-পবিত্র ও নির্মল চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষায় পরিপূর্ণতা লাভ করে খাদিজা (রাঃ) বিশেষভাবে গুণান্বিত হয়ে উঠলেন। তৎকালীন সময়ে আরবে কন্যা সন্তানের জন্মকে অভিশাপ হিসেবে মনে করা হত। সে যুগে এইরূপ সম্মান প্রদর্শন খাদিজা (রাঃ)-এর অসামান্য গুণেরই পরিচয় বহন করে। খাদিজা (রাঃ) ছিলেন অপরূপা সুন্দরী। উত্তম দৈহিক গঠন আর প্রাণ মুগ্ধকর রূপ বৈশিষ্ট্যে তখনকার যুগে শুধু মক্কা কেন সারা আরবদেশে তাঁর মতো দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না।[৫]

বিবি খাদিজা (রাঃ) এর বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর লেখক হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর মদীনায় হিযরতের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ উল্লেখ করেন। বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাসূল (সাঃ)-এর প্রায় সকল কার্যে তিনি জড়িত ছিলেন। মূলত ইসলামের ক্রমবিকাশে বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর অবদান অপরিসীম। একদিকে তাঁর প্রচুর অর্থ-সম্পদ মুহম্মদ (সাঃ)-এর অর্থনৈতিক দৈন্যতা দূর করে, অন্যদিকে নবীর প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও ভালবাসা নবীকে নবুয়াতি দায়িত্ব পালনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগায়। মুহম্মদ (সাঃ) নিজেই বলেছেন, "...আমার বিবাহিত জীবনে এমন দিন কখনও যায় নাই, যখন খদিজার মুখ দর্শন আমার হৃদয়ে আনন্দ ও নববলের সঞ্চার না হইত।"[৬]

খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যুতে মুহম্মদ (সাঃ) যে কতখানি কষ্ট পেয়েছেন, খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি শোকে এতই মুহ্যমান হয়েছেন যে ঘর থেকে বেশি বাহিরে যেতেন না। সাহাবীরা আসলে তাঁদের সঙ্গে সংক্ষেপে কথা বলতেন আর অধিকাংশ সময় ইবাদত বন্দেগী করে কাটাতেন। খাদিজা (রাঃ) কে বৃদ্ধ বয়সে নবী কোন সুখ-শান্তি দিতে পারেন নাই এ দুঃখ তিলে তিলে দংশন করে নবীকে। নবী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করতেন। ইহাতে অনেক সময় নবী পত্নী হযরত আ'য়িশা (রাঃ) বিরক্ত হতেন। মাঝে মধ্যে আ'য়িশা নবীকে খোঁটা দিয়ে বলতেন, "আপনি কি সেই দাঁত পড়া বুড়ীর কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না? আমাদের দ্বারা কি আপনার তেমন খিদমত হয় না? নবী তাহাতে বলিতেন, খদিজার ঋণ আমার শোধ করিবার উপায় নাই।"[৭]

নবী গৃহ সংবাদ-এ নবীর শৈশবকালের কথা থাকলেও মূলত নবীর পারিবারিক জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ের কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বে আমরা বিবি খাদিজা (রাঃ) কে নবী জীবনের এক বিরাট নিয়ামক শক্তি হিসেবে দেখতে পাই। তৎকালীন মক্কার আর্থসামাজিক চিত্রও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। খাদিজা (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যৎ কর্মধারা নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। শৈশবে পিতা-মাতা হারা নবী (সাঃ) নানা প্রতিকূল পরিবেশে জীবনের পথ চলতে চলতে সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও অপরূপ চরিত্রের বলে কিভাবে মানুষের অন্তরে স্থান করে নেন, কিভাবে খাদিজা (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর শুভ পরিণয় ঘটে তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে লেখক বর্ণনা করেন। বরকতুল্লাহ খাদিজা (রাঃ)-এর স্বামী ভক্তি ও আদর্শ নিষ্ঠার যে অনাড়ম্বর অথচ সাবলীল বর্ণনা দিয়েছেন, তা সহজেই ইসলাম ভক্ত পাঠকের হৃদয়ে সাড়া জাগায় তাতে সন্দেহ নেই।[৮]

হযরত উসমান

হযরত ওসমান বরকতুল্লাহর সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ (১৯৬৭)। কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড *খুলাফায়ে রাশেদীন গ্রন্থমালা* প্রকাশের যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তদনুযায়ী মুহম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত *হযরত উসমান* নামে তৃতীয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। *খুলাফায়ে রাশেদীন গ্রন্থমালা*' র প্রথম গ্রন্থ গোলাম মোস্তফা রচিত *হযরত আবু বকর*, ১৯৬৫ সালে ও দ্বিতীয় গ্রন্থটি আবদুল মওদুদ রচিত *হযরত ওমর* প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ *হযরত ওসমান* রচনার দায়িত্ব প্রথমে অর্পিত হয় কবি গোলাম মোস্তফার উপর। কিন্তু গোলাম মোস্তফার অকাল মৃত্যুতে (১৯৬৪) এই জীবনী লেখার দায়িত্ব দেয়া হয় বরকতুল্লাহকে। এ কারণে তৃতীয় গ্রন্থ *হযরত ওসমান* প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। এর মধ্যে চতুর্থ গ্রন্থ *হযরত আলী*

Dhaka University Institutional Repository

(জানুয়ারী ১৯৬৮) প্রকাশিত হয়। *হযরত ওসমান*-এর প্রকাশকাল জুন ১৯৬৯। পরবর্তীকালে গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ বের হয়। তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

লেখকের নিবেদনে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ বলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের ভিতর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জীবনী লেখা ছিল সর্বাপেক্ষা দূরূহ কাজ। হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে সমসাময়িক লেখকগণ ছিলেন অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন। পরবর্তী সময়েও তাঁকে নিয়ে তেমন কোন গবেষণা হয় নি। বরকতুল্লাহ যেসব প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করে গ্রন্থটি লিখেন সেগুলো হল সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত *A Short History of the Saracens*, অধ্যাপক পি.কে. হিট্টী রচিত *The Arabs*, মু'য়র প্রণীত *Annals of the Early Caliphate*, আর.এ. নিকলসনের *Literary History of the Arabs*, ডক্টর তো'হা হোসেন প্রণীত *হযরত ওসমান*-এর মৌলানা নুরুদ্দীন আহমদ কৃত বঙ্গানুবাদ এবং মৌলনা হাজী মঈনউদ্দীন প্রণীত *খুলাফায়ে রাশেদীন*। এছাড়া রোমান শক্তির সঙ্গে মুসলিমদের সংঘর্ষ প্রসঙ্গে তিনি গীবনের সহযোগিতা নিয়েছেন।[৯]

পঁচিশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত আলোচ্য গ্রন্থে লেখক হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর শাহাদাৎ বরণ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন। হযরত ওসমান(রাঃ) কোন সনে জন্ম গ্রহণ করেন তার সঠিক তারিখ পাওয়া যায় নি। আরবদের মধ্যে সেকালে জন্ম-মৃত্যুর তারিখ লিখে রাখার প্রচলনও ছিল না। আরবজাতি অসাধারণ স্মৃতি শক্তিবলে উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের সময় অবাধে নির্ণয় করে ফেলত। কথিত আছে, যে সনে ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা হস্তী বাহিনীসহ মক্কা আক্রমণ করেছিল তার সাত বৎসর পর ওসমান (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। আবরাহার মক্কা আক্রমণ আরবের একটি স্মরণীয় ঘটনা। উক্ত সনটি আরবজাতির নিকট হাতীসন নামে পরিচিত ছিল। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে একটি সূরা রয়েছে। এ সনে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। সে হিসেবে হযরত ওসমান (রাঃ) এর জন্ম ৫৭৬ অথবা ৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বাল্য নাম আমর।

Dhaka University Institutional Repository

পিতার নাম ছিল আফ্‌ফান। সততা ও উদারতার জন্য তিনি আরবের সর্ব মহলে পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। মিশর, সিরিয়া, কুফা প্রভৃতি দেশে তাঁর ব্যবসা বিস্তৃত ছিল। বিশেষত সিরিয়ায় তাঁর কারবার ছিল সর্বাধিক।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর পিতা আফ্‌ফানের গুণের অভাব ছিল না। তিনি অনেক সৎগুণের অধিকারী ছিলেন। গোত্রের মধ্যে তিনি একজন সুযোগ্য এবং জ্ঞানী লোক বলে সবার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ওসমান (রাঃ)-এর মাতার নাম ছিল উরদী বিনতে কারবাজ। তিনিও বুদ্ধিমতী ও গুণবতী রমনী ছিলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-ও পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের ন্যায় মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাই বংশসূত্রের ক্ষেত্রে নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পূর্ব পুরুষ আবদু মানাফ তাঁরও পূর্ব পুরুষ ছিলেন। তাঁর জননী উরদী বিনতে কারবাজ আবদু মানাফ গোত্রীয় মহিলা ছিলেন। তাছাড়া ওসমান (রাঃ)-এর মাতামহী বায়জা ওরফে উম্মূল হাকীম ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহর দুধ বোন। আরবে দুধ ভাই বোনের সম্পর্কের গুরুত্ব কোন অংশে কম ছিল না।

বংশসূত্রের দিক দিয়ে মুহম্মদ (সাঃ)-এর সাথে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও, কুরাইশ বংশের যে দুই শাখায় তাদের জন্ম হয়েছিল, সেই দুই শাখার মধ্যে মোটেও সদ্ভাব ছিল না। তাদের পূর্বপুরুষ আবদু মানাফ ছিল মক্কার কুরাইশকুল এবং অন্যান্য অধিবাসীদের একচ্ছত্র নেতা। তাঁর মৃত্যুর পর নেতৃত্ব লাভ করে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হাশিম। হাশিমের জেষ্ঠ্যভ্রাতা আবদু শামস অপেক্ষা তিনি অধিকতর কর্মঠ ছিলেন। উক্ত কারণে আবদু শামস অধিকতর বঞ্চিত হলেও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উমাইয়া উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্বের দাবী করে এবং ইহা নিয়ে পিতৃব্য হাশিমের সাথে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। ফলে উভয়ের মধ্যকার বিবাদ এক ভীষণ গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। কিন্তু মক্কার বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে এই সংঘাত সংঘটিত হতে পারে নাই। এ সকল হিংসা-বিদ্বেষ উমাইয়া এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাদের পক্ষভূক্ত অন্যান্য কুরাইশদের ইসলামের সাথে বৈরিতার ইন্ধন যোগায়। কারণ ইসলাম আনয়নকারী নিজেই ছিলেন হাশেমী বংশোদ্ভুত। কিন্তু মহিমাময় আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য বড়ই বিচিত্র। উমাইয়ার এক পুত্র হারিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আবু সুফিয়ান ও অপর পুত্র আবুল আসের সন্তান হাকাম ও আফ্ফান রাসূলে করীম (সাঃ) এর প্রাণের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আফ্ফানের পুত্র ওসমান (রাঃ) ছিলেন পরম ধর্মভীরু ও মূর্তি পূজার প্রতি আবাল্য বীতশ্রদ্ধ। পিতৃপুরুষদের আত্ম-অহমিকা ও বিলাসিতা তাঁর চরিত্রে মোটেই ছিল না। ইসলামের আহ্বানে মক্কায় যে চল্লিশজন লোক প্রথম সাড়া প্রদান করেন, হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) চব্বিশ হিজরী সনে গুপ্ত ঘাতকের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বুঝতে পারেন, তিনি আর বাঁচবেন না। তাই ইসলামের আদর্শ গণতন্ত্রের মাধ্যমে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যাওয়া প্রয়োজন মনে করলেন। কতক সাহাবীও তাঁকে আবু বকর (রাঃ)-এর মত পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকেও অনেকে খলিফা নির্বাচনের প্রস্তাব দিলেন। তিনি সবদিক দিয়েই যোগ্য কিন্তু উমর (রাঃ) সবার অনুরোধের জবাবে বললেন, যে গুরু দায়িত্ব আমার জীবিতাবস্থায় স্কন্ধে বহন করেছি, মৃত্যুর পরেও আর তা বহনে ইচ্ছুক নই।

অবশ্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই যে তাঁর অবর্তমানে খিলাফত নিয়ে যাতে পরস্পরের মধ্যে কলহ কোন্দল হতে না পারে, সেজন্য তাঁর উপস্থিতিতেই এই সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তাই তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদিগকে ডেকে ছয়জন বুজুর্গ এবং বিশেষ গণ্যমান্য সাহাবীর নামোল্লেখ করে বলেন, এই ছয়জনের মধ্য হতে পরস্পর পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে যে কোন একজনকে যেন খলিফা নির্বাচন করা হয়। ছয়জন সাহাবী ছিলেন- ১. হযরত আলী (রাঃ) ২. হযরত ওসমান (রাঃ) ৩. হযরত জোবায়ের (রাঃ) ৪. হযরত তালহা (রাঃ) ৫. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ৬. হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত ছয়জন সাহাবীই ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, পরহেজগার এবং ইসলামের প্রতি তাদের প্রত্যেকেরই অবদান ছিল অপরিসীম। হযরত ওমর (রাঃ) মাত্র তিনদিনের সময় দিয়েছিলেন পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করার জন্য। তাঁরা এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের সঙ্গে সা'দ বিন যায়েদ (রাঃ) নামক আর একজন সাহাবীকে নিযুক্ত করে দিলেন। তাঁরা সকলে মিলে ওমর (রাঃ)-এর সুযোগ্য পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কেও তাদের অন্তর্ভূক্ত করে নিতে চাইলে ওমর (রাঃ) তাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, আমার পুত্র আব্দুল্লাহ, সে শুধু খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে নিজের মতামত প্রকাশ করবে কিন্তু নিজে ঐ পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে না। উল্লিখিত ছয় ব্যক্তির মধ্যে একমাত্র আব্দুর রহমান (রাঃ) খিলাফতের প্রার্থী ছিলেন না। বাকী সকলেরই দাবীর পিছনে যুক্তি ছিল। তবে প্রতিযোগিতায় সকলেই প্রায় সমতুল্য যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। সবদিক ভেবে অন্যান্য দাবীদারগণ নিজেদের দাবী আলী (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ) এর দাবীর পক্ষে প্রত্যাহার করেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) যেহেতু নিজে খিলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেছিলেন, তাই এ ব্যাপারে মিমাংসার দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পিত হয়। তিনি সভাসদদের সাথে পরামর্শ করে সর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত ওসমান (রাঃ) কে খলিফা নির্বাচিত করেন। সভা শেষে আব্দুর রহমান (রাঃ) সমবেত লোকগণকে নিয়ে মসজিদে নববীতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করে ওসমান (রাঃ) কে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম জাহানের খলিফা বলে ঘোষনা করলেন।[১০]

হযরত ওসমান (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হওয়ায় হাশেমীয় গোত্রের লোকজন ছাড়া প্রায় সকলেই একটি উদ্বেগপূর্ণ সমস্যার সমাধান হওয়ার জন্য খুশি হলেন। সর্বাধিক খুশি হলেন উমাইয়া বংশীয়গণ। কেননা এতদিন মুসলিম জাহানে ক্ষমতা দখলের যে স্বপ্ন তাদের ছিল এবার তাদেরই এক ব্যাক্তির হাতে সেই ক্ষমতা অর্পিত হওয়ায় তাদের স্বপ্ন বাস্তবে রুপায়িত হল।

হযরত ওসমান (রাঃ) যে সময়ে খেলাফতের আসনে বসেছিলেন তখন চারদিক থেকে একটির পর একটি বিরাট সমস্যা এসে উপস্থিত হলো। তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বিশেষ করে আরব

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের নৈতিক অবনতি হতে শুরু করে। হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর আরবজাতির আদিম স্বভাব প্রকাশ হলে খলিফা আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর কঠোর শাসনে কয়েক বছর শান্ত ছিল কিন্তু খলিফা ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর আরব জাতির সেই আদিম স্বভাব আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কেননা হযরত ওসমান (রাঃ) সৎ চরিত্রের অধিকারী হলেও শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন দুর্বল। তাঁর সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, "Osman, thought virtuous and honest, was very old and feeble in character and quite unequal to the lask of government. ফলে His election proved in the end the ruin of Islam."[১১]

হযরত ওসমান (রাঃ) খেলাফত লাভ করায় তাঁর নিজ বংশ উমাইয়ারা খুবই খুশি হয়। ওসমান (রাঃ)-এর পক্ষ থেকেও উমাইয়ারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা পায়। তিনি আত্মীয় স্বজনকে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেন। যদিও তা নির্বাচকমণ্ডলী প্রদত্ত শর্তের বাহিরে ছিল। যারা তাঁর কাছ থেকে বিভিন্নভাবে সুবিধা লাভ করে তারাই তাকে জনগণের কাছে অপ্রিয় করে তোলে। এ সম্পর্কে বরকতুল্লাহ বলেন, "নবনিযুক্ত গভর্ণরগণ অধিকাংশ ছিলেন উমাইয়া গোত্রের লোক, অথবা খলিফার আত্মীয়-স্বজন। ইঁহারা কোরাইশ ছিলেন এবং কোরাইশ-সুলভ অহমিকা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা ছিল ইহাদের মজ্জাগত ব্যাধি। এই দোষে ইঁহারা কখনও জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। প্রজাগণ তাঁহাদের ব্যবহারে ব্যথিত হইত।"[১২]

ওমর (রাঃ)-এর আমলে জমির অধিকার থাকত শুধু তাদের যারা নিজেরা জমি চাষাবাদ করত। ওসমান (রাঃ)-এর আমলে এই নীতির পরিবর্তন হয়। এ সময় বিত্তশালী লোকজন ইচ্ছামত জমি খরিদের সুযোগ পেয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বহু ভূ-মালিকের জন্ম হয়। এর ফলে এক শ্রেণীর লোক ধনী ও আরেক শ্রেণীর লোক গরীব হতে গরীব হয়ে চলল। এতে শ্রেণী বৈষম্যের অসন্তোষ সৃষ্টি হয় যা খলিফাকে সমালোচনা মুখর করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা হিসাবে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যে কোন কৃতিত্ব ছিল না তা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সকল সিদ্ধান্তই প্রজা অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রজাদের কাছ থেকে যখন খলিফা ওসমান (রাঃ)-এর নিকট অভাব অভিযোগ ক্রমাগত পৌঁছাতে লাগল তখন হযরত আলী (রাঃ) এ সকল বিষয় প্রতিকারের জন্য খলিফাকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বার বার উপেক্ষিত হয়েছেন। এমনকি অনেক সময় তিরস্কৃতও হয়েছেন। কারণ খলিফা মনে করতেন, তাঁর দোষ উদঘাটন করাই আলী (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য। আলী (রাঃ) খলিফার দিকে যতই সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, কূটনীতি পরায়ন মারওয়ান ততই তাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, যেন কোন পরিস্থিতিতে তিনি হাশেমী গোত্রের প্রভাবে না পড়েন। এই দুষ্টচক্রের অধিনায়ক মন্ত্রী মারওয়ান একদা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বহিস্কৃত হয়েছিলেন।

বিভিন্ন কারণে কতিপয় ব্যক্তি জনগণকে খলিফার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলে। যার ফলে এক পর্যায়ে বৃদ্ধ খলিফাকে জীবন দিতে হয়। অথচ এই নির্মম হত্যাকাণ্ড রোধ করা সম্ভব হত। কিন্তু যারা বিদ্রোহীদের দমন করতে পারতেন তারা ছিলেন বিস্ময়করভাবে অনেকটা নির্লিপ্ত। হযরত আলী (রাঃ)-ও সে অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। বরকতুল্লাহও এ বিষয়টি আলোচ্য গ্রন্থে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেছেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে এ সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করেন।[১৩] তারপরও তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর ভূমিকা সম্পর্কে সমালোচনা করেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সহিত বিদ্রোহীদের সরাসরি বিতর্কের পর তিনি শুক্রবার দিন জু'মার নামায পরিচালনা করে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এমন সময় বিদ্রোহীরা মসজিদের ভিতরে হট্টগোল শুরু করলে মদিনার শান্তি প্রিয় নাগরিকরা বিদ্রোহীদের প্রতিবাদ জানালে বিদ্রোহীরা নিরীহ নাগরিকদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মসজিদ হতে বের করে দেয়। একটি প্রস্তর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মাথায় লাগলে তিনি আহত হন। আহত ওসমান (রাঃ)-কে তাঁর বাসগৃহে আরও অনেকের সঙ্গে হযরত আলী (রাঃ)ও দেখতে যান। কিন্তু তারা প্রবেশ মাত্র মারওয়ান ও খলিফার অন্যান্য নিকট আত্মীয়রা তাকে দেখে ক্রুদ্ধভাবে চীৎকার করে উঠেন এবং আলী (রাঃ)-কে এই বিপদের মূল স্রষ্টা বলে দোষারোপ করেন। একদিন এই বিপদ তাঁর উপরও

Dhaka University Institutional Repository

আবর্তিত হবে বলে তাঁকে অভিসম্পাত দেয়া হয়। এই দুর্ব্যবহারে হযরত আলী ক্রুদ্ধ হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তাঁর সঙ্গের লোকজনও চলে যান। এ ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাদের এভাবে প্রস্থানকে বরকতুল্লাহ সমীচিন হয়েছে বলে মনে করেন নি। এ সম্পর্কে বরকতুল্লাহর বক্তব্য হচ্ছে, "খলিফাকে এই সময় এইরূপে ত্যাগ করিয়া যাওয়া ছিল তাহাদের পক্ষে চরম নিষ্ঠুরতা ও ভীরুতা এবং ইহার বিষময় ফল শুধু একা ভোগ করেন নাই, তাহাদের প্রত্যেককেই ভুগিতে হইয়াছিল। ইহা শুধু নৈতিক হিসাবেই অন্যায় কার্য ছিল না, রাজনীতির দিক দিয়াও একটা মারাত্মক ভুল ছিল।"[১৪]

এই মূল্যায়নের বাস্তবরূপ প্রকাশ পায় ওসমান পরবর্তী মুসলিম শাসনালে। হযরত আলী (রাঃ) খেলাফতচ্যুতি ও নিহত হওয়ার ঘটনা ওসমান (রাঃ) হত্যারই পরিণতি। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাঁর নির্মম হত্যাকন্ডের ফলে মদীনায় এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়। খলিফা না থাকায় শহরের কর্তৃত্ব ছিল বিদ্রোহীদের হাতে। তাদের মধ্যে মিশরীয়দের আধিপত্য ছিল বেশী। তাদের নেতা গাফিকী মসজিদে নববীতে ইমামতি করত। এই ইমামতি ছিল রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার নিদর্শন। খলিফা হত্যার পঞ্চম দিনে বিদ্রোহী নেতারা মদীনাবাসীগণকে আহ্বান করে জানিয়ে দিল যে, তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই যেন মদীনার নাগরিকগণও তাদের নির্বাচন অধিকার প্রয়োগ করে মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য একজন যোগ্য খলিফা নির্বাচন করে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে।

রাষ্ট্রের শোচনীয় অবস্থায় আলী (রাঃ) এত ম্রিয়মান হয়ে পড়েন যে, তিনি প্রবীণ সাহাবী তালহা অথবা যুবাইর (রাঃ) এদের যে কোনও একজনের হাতে বায়াৎ হতে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ রাজী না হওয়ায় এবং বিদ্রোহীদের চাপে ও মদীনায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রাঃ)-কে খিলাফতের বিপদসঙ্কুল দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তালহা ও যুবাইর (রাঃ) সর্বপ্রথম আলী (রাঃ)-এর হাতে হাত রেখে আনুগত্য স্বীকার করেন। সিরিয়ার গভর্ণর মুয়াবিয়া (রাঃ), মিশরে শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ, নিহত খলিফার মন্ত্রী মারওয়ানসহ কয়েকজন বায়ৎ গ্রহণ না করে গোপনে চলে যান। কিন্তু সেজন্য আগের মত তাদের নিকট

Dhaka University Institutional Repository

কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া হল না। এ থেকে বোঝা যায় মুয়াবিয়া (রাঃ) সহ উমাইয়ারা খলিফা হিসেবে আলী (রাঃ)-কে চান নি এবং তাদের বিরুদ্ধে নবনিযুক্ত খলিফার করারও কিছু ছিল না। আলী (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বিদ্রোহীরা মদীনা ত্যাগ করে এবং পুনরায় শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু সেই শান্তি ছিল ক্ষণস্থায়ী। অল্প সময়ের মধ্যেই হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। তালহা (রাঃ), যুবাইর (রাঃ), রাসূল পত্নী আয়েশা (রাঃ) ও সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিশাল দূরত্বের সৃষ্টি হয়। যা এক পর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয়। উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধের মাধ্যমে প্রত্যেকের ভূমিকা পরিস্কার হয়ে ওঠে। এ সকল যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। যাতে বিখ্যাত সাহাবী তালহা ও যুবাইর (রাঃ) সহ অসংখ্য হাফেজে কোরআন শাহাদাৎ বরণ করেন। যার পরিণামে হযরত আলী (রাঃ) কেও জীবন দিতে হয়। এরপর থেকে ইসলামের ইতিহাসে সূত্রপাত হয় রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) প্রবর্তিত নীতি ও আদর্শ থেকে ইসলামের পতাকাবাহীরা ক্রমশ দূরে সরতে থাকে। শুধু তাই নয় হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাকে হত্যা করার সময় যে সব পৈশাচিক কাণ্ড ঘটানো হয় তা পাঠ করলে গা শিহরিত হয়ে উঠে।

প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পুত্র মুহম্মদ বিন আবুবকর ওসমান (রাঃ)-এর দাড়ি উৎপাটনের চেষ্টা করে এবং অসহায় খলিফাকে অবমাননাসূচক গালি বর্ষণ করে। এতে বৃদ্ধ খলিফা বললেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার পিতা কিছুতেই আমার সহিত এমন ব্যবহার করিতেন না। আল্লাহ আমার সহায়। তোমার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি।"[১৫] পিতার নাম উল্লেখ পূর্বক অসহায় খলিফার এই করুণ কথায় মুহম্মদ বিন আবু বকর লজ্জিত হয়ে খলিফাকে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কতিপয় পাপিষ্ঠ ছুটে এসে খলিফার প্রতি চড়াও হল। খলিফা তখন কোর'আন পাঠ করছিলেন। পাপিষ্ঠদের আক্রমণকালে পবিত্র কোরআন শরিফ মাটিতে পড়ে যায়। বিদ্রোহীরা তা পদদলিত করেই খলিফার দেহে খঞ্জর চালাতে থাকে। খলিফা-পত্নী নায়লা নির্মম আক্রমণের মুখে স্বামীকে রক্ষা করার জন্য নিজের দেহ দ্বারা খলিফার আহত দেহ আড়াল করার চেষ্টা করেন। তাতেও

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহীদের তরবারি ক্ষান্ত হয় নি। তাদের আঘাতে নায়লার হাতের কয়েকটি আঙ্গুল কেটে যায়।

খলিফার মৃত্যুতে উন্মুক্ত জনতা পাশবিক তাণ্ডব শুরু করে। তারা খলিফার দেহ হতে মস্তক কেটে নেওয়ারও উপক্রম করে কিন্তু গৃহের রমণীদের আর্তচিৎকারে বর্বরগণ বিরত হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জন্ম থেকে শুরু করে তার খিলাফত আমলের প্রায় সকল ঘটনাবলীর বিবরণ অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে বরকতুল্লাহ্ *হযরত ওসমান* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কিছু মতামত রয়েছে। যা থেকে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। তাই এ সম্পর্কে লেখকের নিবেদনে বরকতুল্লাহ্ বলেন,

> আজ চৌদ্দশত বৎসরের ব্যবধান পার হইয়া তাঁহার জীবনালেখ্য উন্মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় পৌঁছিতে পারিয়াছি কিনা তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই। সে বিচার করিবেন সুধী সমাজ। তবে ঘটনার সন্নিবেশ যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে করিয়াছি, যাহাতে সত্যাসত্য নিরূপণে পাঠকদের সম্মুখে বাধার সৃষ্টি না হয়।[১৬]

425551

বরকতুল্লাহর এ উক্তির মাধ্যমেই গ্রন্থটির সার্থকতা ফুটে ওঠে।

পারস্য প্রতিভা

পারস্য প্রতিভা গ্রন্থের জন্য খ্যাত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ ফারসী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। বি.এ. ক্লাশে তাঁর অন্যতম পাঠ্য বিষয় ছিল ফারসী। তরুণ বয়সেই তিনি সুফি কবিদের জীবনী ও রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেন। পারস্য কবিদের কাব্য ও কবিতাকে সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় তিনি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেন। রাজশাহী কলেজে বি.এ পড়ার সময়ই কবি ফেরদৌসী ও কবি হাফিজ সম্পর্কে রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিনে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লেখেন। তরুণ বয়সেই বরকতুল্লাহ্ লক্ষ্য করেন প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে এদেশে ফারসী ভাষা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় মর্যাদা হারানোর ফলে ফারসী সাহিত্যের চর্চা ক্রমশ কমে আসছে। যার ফলে মুসলিম ধ্রুপদী সাহিত্যের অমূল্য ভান্ডারের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক বিশেষ করে বাঙ্গালী মুসলমানের পরিচয় নেই বললেই চলে। তাই লেখক *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে পারস্যের মহাকবিগণের পরিচয় তুলে ধরে বঙ্গ ভাষা-ভাষী পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন।

বরকতুল্লাহ রচিত *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে তৎকালীন পারস্য কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনামূলক কোন পুস্তক বাংলা সাহিত্যে ছিল না। এমনকি ইংরেজীতেও এ সকল তথ্য সম্বলিত কোন পুস্তক ছিল না। কোন মুসলমান লেখক বাংলা ভাষায় পারস্যের এই সমৃদ্ধ সাহিত্য ভাণ্ডারের সাথে বাঙ্গালী পাঠকদের পরিচয় করে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। তবে এক্ষেত্রে মুহম্মদ আকমলের শেখ সাদীর *পান্দনামা* অনুবাদ (১৮৬৩), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) রচিত *ফেরদৌসী চরিত* ও *শাহনামা* কাব্যের অনুবাদ *শাহনামা ১ম খণ্ড* (১৯০৯), শেখ মুহম্মদ আবদুল কাদির রচিত *গুলিস্তা* (১৯০৫) ও *বুস্তার* অষ্টম অধ্যায়ের গদ্যানুবাদ (১৯১৮) সেটির নাম দিয়েছেন *নীতিকানন*। মুনশী মেহেরুল্লাহর (১৮৬১-১৯০৭) কিছু ফারসী নীতি কবিতার অনুবাদ *পান্দনামা* (২য় খন্ড-১৯০৮)-কে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যায়। এছাড়াও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২), কাজী আকরাম হোসেন (১৮৯৬-১৮৬৩), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৪) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ফারসী রচনাবলীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বরকতুল্লাহর *পারস্য প্রতিভা* (১ম খণ্ড-১৯২৪, ২য় খণ্ড-১৯৩২) প্রকাশের পর বা সমসাময়িক সময়ে। ফারসী সাহিত্যের সাথে বাঙালী পাঠকদের পরিচয়ে হিন্দু লেখকদেরও ভাল ভূমিকা ছিল। গিরিশচন্দ্র সেনের (১৮৩৫-১৯১০) *দিওয়ান-ই-হাফিজ*, শেখ সাদীর *গুলিস্তা, বুস্তা, মসনভ-ই-রুমী* প্রভৃতি গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭) রচিত *সদ্ভাব শতক* (১৮৬১), বিনোদন বিহারী মুখার্জির *ওমর গীতি* (১৯১৪), সুরেন রায় রচিত *ওমর প্রসাদ* (১৯১৯), কান্তি চন্দ্র ঘোষ রচিত *রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম* (১৯২১), বিজয় কৃষ্ণ ঘোষের ওমর খৈয়ামের অনুবাদ (১৯২২), সুরেশ চন্দ্র নন্দী রচিত *কবি শেখ সাদী* (১৯২৩) উল্লেখযোগ্য।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম সাকলায়েন-এর মতে ফারসী সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় মুসলিম লেখকদের অনাগ্রহ দেখে বরকতুল্লাহ ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ সম্পর্কে গোলাম সাকলায়েন লিখেছেন, "সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের অনগ্রসরতার জন্য তাঁর মনে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তাই তিনি মনে করতেন, যদি মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কালী প্রসন্ন ঘোষের মতো ভাষা ও বর্ণ-বিন্যাসের সাহায্যে উপস্থাপনা করা যায়, তবে তা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের কাছে গ্রাহ্য হবে।"[১৮]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় বরকতুল্লাহ পারস্য সাহিত্য সম্পর্কে জানার ব্যাপক সুযোগ পান। সে সময়ে তিনি কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে চার বৎসর গবেষণা করে *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ রচনা করেন।

পারস্য প্রতিভা প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বেঙ্গল লাইব্রেরী থেকে। প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত বিষয়াবলী ছিল-

১. পারস্য সাহিত্য
২. কবি ফিরদৌসী
৩. ওমর খইয়াম
৪. শেখ সাদী
৫. কবি হাফিজ
৬. জালালুদ্দীন রুমী।

পারস্য প্রতিভা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মোহাম্মদী প্রেস থেকে। দ্বিতীয় খণ্ডে সাতটি প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত ছিল-

১. পারস্যের উর্ব্বর যুগ
২. ফরিদ উদ্দীন আত্তার
৩. নাসির খসরু ও ইসমাইলী মত
৪. নেযামী

Dhaka University Institutional Repository

৫. মোল্লা জা'মী

৬. সুফীমত ও বেদান্ত

৭. সুফীমত ও নিউপ্লেটোনিজম।

১৯৬৪ সালে *পারস্য প্রতিভা* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে প্রথম খণ্ডের পাঁচটি ও দ্বিতীয় খণ্ডের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড সম্মিলিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয় গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ৩৪ বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে।[১৯] সম্মিলিত সংস্করণে বিষয়বস্তু ও বিষয় বিন্যাসে কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বৈচিত্র আনা হয়। পারস্যের সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনাকে একত্রে লিপিবদ্ধ করে ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকায় স্থান দেয়া হয়েছে। *পারস্য প্রতিভা*-র মাধ্যমে বাঙ্গালী পাঠক পারস্য সাহিত্যের দিকপাল কবি, দার্শনিক ও লেখকদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ পেয়েছে। এ সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন,

> বরকতুল্লাহর সাধনায় বাঙালি পাঠক পারস্যের ভুবন বিখ্যাত অমর কবি ফেরদৌসী, আত্তার, রুমী, জামী, সাদী, হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছে। পারস্য সাহিত্যে ক্লাসিক সৌন্দর্য ক্লাসিক্যাল বাংলা গদ্যে বরকতুল্লাহ এমন সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন যে তাতে পারস্য সাহিত্যের রসও অপরিবর্তিত রয়েছে।[২০]

বরকতুল্লাহ ফারসি সাহিত্যের গৌরবময় যুগের যে সকল বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক, লেখকদের নিয়ে *পারস্য প্রতিভা* রচনা করেছেন সেই যুগের সময়কাল ছিল পূর্বাপর খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ে ফারসি সাহিত্যে চরম উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

পারস্য প্রতিভা লেখকের গবেষণামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ হলেও এর ভাষা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বরকতুল্লাহ বলেছেন,

> ... কালে হয়ত এমন দিনও আসিতে পারে যখন বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট ফিরদৌসী, হাফিয, সা'দী, রুমী এবং ওমর খইয়াম প্রমুখ অমর কবিগণের স্মৃতি, হোমার, গ্যেটে প্রভৃতি বৈদেশিক কবিদের মতই শুধু নামেমাত্র পর্যবসিত হইবে। "পারস্য প্রতিভা" বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তেমন দিনে পারস্যের মহাকবিগণের পরিচয় জানার পক্ষে রস-পিপাসু বঙ্গভাষা-ভাষী পাঠকদের কিঞ্চিৎ কাজে লাগিতে পারে।[২২]

এ উদ্দেশ্যেই লেখক *পারস্য প্রতিভা*'র মতো অমর গ্রন্থ রচনায় অণুপ্রাণিত হয়েছেন।

পারস্য প্রতিভা-য় পারস্যের গৌরবময় যুগের নয়জন কবি ও দু'জন দার্শনিকের জীবনকাহিনী ও মতাদর্শের পরিচয় মেলে। বরকতুল্লাহ এই নয়জন কবি ও দার্শনিকের জীবনালেখ্য ও সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে দুটি ভাগে আলোচনা করেছেন। প্রথম পর্বে আছেন ফেরদৌসী , ওমর খৈয়াম, শেখ সাদী ও নাসির খসরু এবং দ্বিতীয় পর্বে নেযামী, ফরিদউদ্দিন আত্তার, মৌলানা রুমী, হাফিজ ও মোল্লাজামী।

দ্বিতীয় ভাগের কবিরা ছিলেন সুফিপন্থী। এসকল কবিদের বলা হয়েছে 'সাধক কবি'। তাদের কাব্য সাধনার মূলে ছিল মরমীবাদ। জালাল উদ্দীন রুমীর কবিতার স্বরূপ দিতে গিয়ে বরকতুল্লাহ লিখেছেন,

> জালাল উদ্দীন কবিতাকে সামান্য বাক্য-বিন্যাস মাত্র মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, কবির (যেমন তাহার নিজেরও) প্রাণ বংশীস্বরূপ। যে বেণুবনে এই বাঁশীর উদ্ভব সেইখানেরই শেখা গান এখানে সে নানা সুরে ব্যক্ত করে। যাহারা কবির শুধু সুরের রস ভোগ করে তাহারা ভ্রান্ত। কবির বাঁশরী যে গান গায় সেই গানের

Dhaka University Institutional Repository

> সত্যকে বুঝিতে হইবে, তবেই তোমরা সত্য-জীবনের ও পরমার্থের গোপন সন্ধান লাভ করিতে পারিবে।[২৩]

কবি ফেরদৌসী সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই বরকতুল্লাহ কবি ও কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। কবির দৃষ্টি ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কবির চোখ বস্তুর অন্ত র্লোকে পৌঁছায় আর সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র বস্তুকেই দেখে থাকে।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে আরব কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের উপর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পরবর্তীতে মোঙ্গল আক্রমণে আব্বাসীয় শাসনের পতনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এ সকল রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হয় এবং এ সাহিত্যের নবজন্ম ঘটে। এ সম্পর্কে বরকতুল্লাহ বলেন,

> খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাগদাদের বিশাল সাম্রাজ্য যখন বহুসংখ্যক খন্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল, সেই সময় পারস্যে নবীন স্বাধীনতার আলোকে প্রকৃতভাবে নবযুগের সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতে পারস্যের মুসলমান নরপতিগণ তত্রত্য সাহিত্যের উন্নতি বিধানে বিশেষ যত্নবান হন। ইহাঁদের প্রত্যেকেই বহুসংখ্যক কবিকে আশ্রয় ও বৃত্তি দান করিয়া স্ব স্ব সভার গৌরব বর্ধন করিতেন। পারস্য কবিগণ এককালে বিজয়ী আরবদিগের সন্তোষ বিধানার্থ প্রভূত পরিমাণে আরবীয় সাহিত্যের চর্চা করিতেন এবং স্ব স্ব রচনায় ভুরি ভুরি আরবীয় শব্দ ও আরবী ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া উহা শাসক সম্প্রদায়ের সহজবোধ্য করিয়া তুলিতেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পারস্যের স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে সব সাহিত্যের অভ্যুত্থান হয় একাদশ শতাব্দীতে তিনজন প্রবল প্রতাপ নরপতির বিদ্যোৎসাহে উহা পল্লাবিত ও মুঞ্জরিত হয়।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল নরপতিরা তাদের রাজধানীকে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পাদপীঠে পরিণত করেন তাঁরা হলেন- পারস্যে মালিক শাহ, গজনীতে সুলতান মাহমুদ ও তাঁর উত্তরাধিকারী কাদির-বিন-ইব্রাহীম এবং তুর্কিস্থানে কাদির খান। পারস্য সাহিত্যের সৌন্দর্য ও লালিত্য এতই চিত্তাকর্ষক ছিল যে দুর্বৃত্ত তাতারগণও এতে মুগ্ধ না হয়ে পারে নি। হিন্দুস্থান বিজেতা সম্রাট বাবর নিজের মাতৃভাষার পরিবর্তে ফারসীকে রাজভাষার মর্যাদা দেন। বাবরের পূর্বপুরুষ মহাতেজা তৈমুরের প্রলয়ঙ্করী হাতেও একদিন কবি হাফিজের জন্য আশীর্বাদের খেলাত ও অগণিত মণি-মুক্তা উঠে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ তুর্কী বীর দ্বিতীয় মুহম্মদ যখন কনস্টান্টিনোপল জয় করেন, তখন সেই বিজয়োন্মত্ততার ভিতরও জামীর কবিতার রসাস্বাদন করিতে বিস্মৃত হন নাই। এই সাহিত্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে সুফিবাদের প্রভাব। ইসলামে এই মরমীবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকেই ভারতীয় দর্শন, নিওপ্লেটোনিজম প্রভৃতির প্রভাব রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। বিভিন্ন কারণে তৎকালীন পারস্যে বিদেশী প্রভাব এই ভাবধারায় সহায়ক ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে পারস্যের সর্ম্পক গড়ে উঠে। সাসানীয় আমলে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হয়। পারসিয়রা ভারত থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করত। গ্রীসের সঙ্গে পারস্যের পূর্ব থেকেই সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের ফলেই প্লেটোর মতবাদ পারস্যে প্রসার লাভ করে; মুসলিম যুগে সুফি মতবাদকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।[২৫] বিভিন্ন উপায়ে সুফিবাদ পারস্যে যে রূপ পরিগ্রহ করে তার সঙ্গে ইসলামের বিরোধ ছিল সুস্পষ্ট। আল্ গাজ্জালীর (১০৫৮-১১১১ খ্রিঃ) আবির্ভাবের পূর্বে সুফিদিগকে শরীয়ৎপন্থী মৌলানারা খাটি মুসলমান বলে গণ্য করতে দ্বিধাবোধ করতেন। আল্ গাজ্জালী শরীয়ৎ ও মারেফাৎ এর মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করেন এবং প্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে সুফিবাদ প্রচারে তাঁর প্রভাব পড়ে।

পারস্য প্রতিভা'র ভূমিকায় বরকতুল্লাহ ফারসী গীতি কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে ইউরোপীয় গীতি কবিতার সঙ্গে ফারসী গীতি কবিতার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ইউরোপীয় গীতি কবিতার যাত্রাকালে তা বীণাযন্ত্র সহযোগে ফারসী কবিতার মতো গীত হতো কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা হয়ে দাঁড়ায় একান্তভাবে পাঠ্য। অপরদিকে ফারসী গীতি কবিতা বা গজল একাধারে

Dhaka University Institutional Repository

গান ও কবিতা। পারস্যের গৌরব দিনে বরযত নামক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে এ সকল গজল গীত হতো। ভারত উপমহাদেশে গজল সুর করে পাঠ করার রেওয়াজ এখনও চালু আছে। গজলের রোমান্টিকতা সম্পর্কে বরকতুল্লাহ লিখেছেন,

> যেই দিন নিশীথে চাঁদের আলোতে আকাশ ভরিয়া যাইত, দক্ষিণ হাওয়ার বিবশ পরশে প্রাণ আবেশে ঢুলু ঢুলু করিত, সেই সকল রজনীতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বা উদ্যানবাটিকায় উচ্ছৃংখল সাহিত্যিকদের সভা বসিত। আর, চন্দ্র যখন পশ্চিমাকাশের কৃষ্ণ নিবিড়তার ভিতর ঘুমাইয়া পড়িত, তখন পর্যন্ত তাঁহাদের সেই "গোলাবের ইতিহাস", "বুলবুলের প্রণয় কথা", "সুরার মহিমা" ও "প্রেমের মাধুরী" গীতাকারে চলিতে থাকিত।[২৬]

প্রেম ও সৌন্দর্যই হচ্ছে ফারসী গীতি কবিতার মূল উদ্দেশ্য। মানবের ভিতরকার ধর্ম ও ভাবগত সংঘাত ফারসী পরিবর্তনের সূচনা করে। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বরকতুল্লাহ ভিন্ন প্রকৃতির দুই কবি শেখ সাদী ও হাফিজকে গ্রহণ করেছেন। সাদী ও হাফিজের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে বরকতুল্লাহ লিখেছেন,

> সা'দী চাহিতেন নিয়মের ভিতর থাকিয়া যার যার কর্তব্যের শৃঙ্খল অক্ষুন্ন রাখিয়া, ধ্যান ও ধারণার দ্বারা খোদাকে প্রাণের ভিতর উদ্বুদ্ধ করিতে; আর হাফিজ চাহেন সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া, মানুষ-কল্পিত সকল কর্তব্য বিসর্জন দিয়া, অনুভূতির দ্বারা, আবেগের দ্বারা, সেই প্রেমময়কে প্রেয়সীর মত আলিঙ্গন করিতে। হাফিজের জগতে মানুষের প্রচলিত অনুশাসনের কোনও মূল্য নাই। তিনি সাদীর ন্যায় প্রাণকে সর্বপ্রকারে সংযত সংহত করিয়া একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে চাহেন না। তিনি চাহেন অবাধ সম্ভোগের দ্বারা আত্মার পরিতৃপ্তি।[২৭]

পারস্যের কবি সাহত্যিকদের এই ভাব সংঘাতের ফলেই ফারসি সাহিত্যে পরিবর্তনের সূচনার মাধ্যমেই জন্ম হয় নতুন ধারার। পারস্য সাহিত্যের সে ধারা সম্পর্কে বরকতুল্লাহ লিখেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

> rationalism এর পর sensationalism ও Mysticism এর এইরূপ পর্যায়ক্রমিক অভিব্যক্তি মানব সমাজে চিরন্তন; সকল যুগেই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। কঠোর সংযমের পর উদ্দাম ভাব-বিলাসের এই লীলাভিনয় যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন পারস্য সাহিত্যের আর একবার দিক্ পরিবর্তন ঘটিল। তটাহত তরঙ্গের ন্যায় উহার গতি আবার অন্য পথে প্রধাবিত হইল। মহাকবি জামীতে গিয়া এই বিবর্তিত ধারা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। জামীর শেষ বয়সের সাহিত্যে সকল রকম রস-চাঞ্চল্য যত্ন সহকারে বর্জিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তী রুমীতে উক্ত উভয় ধারার একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়। রুমীতে সা'দীর সংযম ও হাফিযের ভাবাবেগ উভয়ই সন্নিবিষ্ট, কিন্তু ভাব এখানে সংযমের দ্বারা শাসিত হইয়া এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে।[২৮]

পারস্য প্রতিভা-য় আলোচিত কবি সাহিত্যিকদের জীবন ও কাব্য সাহিত্য পর্যালোচনায় পরিবর্তনের এ ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ পারস্যের উর্বর যুগের কাব্যে-দর্শনে-ধর্মতত্ত্বে যে এগারজন জগৎবিখ্যাত মনীষীর জীবনী ও লেখনী শক্তির পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তিনি নিজেও বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "গ্রন্থটিতে বরকতুল্লাহ একাধারে ঐতিহাসিক, দার্শনিক, জীবনীকার ও সাহিত্য-সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর রচনার ভাষায় চিত্রকরের চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা, সংবেদনশীল কবি মনের স্পর্শ ও পণ্ডিতমনের ঋদ্ধি একই সাথে প্রত্যক্ষ করা যায়।"[২৯]

পারস্য সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্যের পরিচয় প্রদানে বরকতুল্লাহ *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থটি সুমধুর অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করে বাঙ্গালী পাঠক সমাজকে অভিভূত করেছেন। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় *পারস্য প্রতিভা*'র ভাষার বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রশংসনীয় মন্তব্য করেছেন এভাবে,

Dhaka University Institutional Repository

দর্শনতত্ত্বের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যায় এ ভাষা হয়ে উঠেছে ধীরগতি, গম্ভীর, অনুসন্ধানপর, অন্তঃশীলা; আবার বিচিত্র ঘটনাকীর্ণ জীবনের কাহিনী বনর্ণায় তা হয়ে উঠেছে কলস্বনা নদীর মত উচ্ছ্বসিত, তাতে এসেছে ঝর্ণাধারার তীব্র গতি। প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় তা একান্ত মুগ্ধ বিস্ময়ানন্দে আপ্লুত, মানব হৃদয়ের আবেগানুভূতির প্রকাশে তা একান্ত দ্রব-তাতে তখন জেগে উঠেছে কবিত্বের স্পন্দন। কখনও বা তা চিত্রকরের তুলির মুখে কথার বর্ণাঢ্য রেখার সমবায়ে ফুটিয়ে তুলেছে প্রকৃতি ও মানবের অন্তরঙ্গ ছবি।[৩০]

পারস্য প্রতিভা থেকে লেখকের এই ভাষা ভঙ্গির তিনটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো,

১.একদা মরণ সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে দাঁড়াইয়া কোনও আরবীয় সাধক বলিয়াছিলেন, বাল্যবন্ধু শে'খ সা'দীর দ্বারা যেন তাঁহার জীবনের শেষ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ...ব্যথিতের আর্তনাদকে ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়া তাঁহার জীবনের কুন্দ কুসুম নীরবে ঝরিয়া গেল। শাহানশাহ সম্রাট ও দীন হীন প্রজা যে ভবনে একই মূল্য বহন করে, বিশ্ব-বিজয়ী সেকেন্দার ও আশ্রয়হীন কাঙ্গাল যেখানে একই সজ্জায় নীত হয়, সেই গৃহ সাধুর জন্য নির্মিত হইল। কিন্তু শে'খ সা'দীর সন্ধান আজ কোথায় মিলিবে? ছয় মাসের পথ সিরাজ নগরে এ মৃতের আকুল কামনা কবে পৌঁছিবে, কবে সে প্রতিশ্রুত পথিকের আকাঙ্খিত আগমন সূচিত হইবে? এতদিন কি তাঁহারই পথপানে চাহিয়া এ দেহ এমনই করিয়া সমাধির দ্বারে পঁচিতে থাকিবে? জগৎ যে আর তাঁহাকে চায় না, পৃথিবীর পৃষ্ঠে আর তাহার স্থান কোথায়? .... দেখা গেল, এক শুক্লাম্বর শ্বেতশ্মশ্রু বিলম্বিত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ দণ্ডায়মান; মস্তকে শ্বেতোজ্জল শিরস্ত্রাণ, হস্তে রজত-শুভ্র যষ্টি, নয়নে স্বর্গের বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃপ্রভা। প্রাণের উৎসারিত বেদনা-রাশি জমিয়া যেন তাহার বদনের সৌম্যতাকে অধিকতর নিবিড় করিয়া দিয়াছে। সে তেজঃপুঞ্জ মূর্তি যে দেখিল তাহারই হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল ও মস্তক আপনা-আপনি তাঁহার পাদম মূলে আনত হইয়া আসিল। সাদী বিনয়ে কহিলেন, বন্ধুগণ, যে পবিত্র দেহের শেষ ক্রিয়া সাধনার্থ ছয়মাস পূর্বে আমি গৃহত্যাগ করিয়াছি, তাহারই সৎকার হইতে আমার বহুবর্ষের লালিত

Dhaka University Institutional Repository

আকাঙ্খাকে আজ ব্যর্থ করিয়া দিও না। আজ আমি বাল্য-প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া ঋণমুক্ত হইবার জন্য এই তীর্থ ভূমিতে ছুটিয়া আসিয়াছি।[৩১]

২.সায়ংকাল-মৃদু সমীরণ রহিয়া রহিয়া তরুলতা দোলাইয়া দোলাইয়া বহিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকালের লোহিত রঞ্জিত মেঘমালার কিরণ পরিব্যাপ্ত হইয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুকে অপূর্ব সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়াছে। নিস্তরঙ্গ বায়ুপ্রবাহে দূরাগত বিহগের ললিত কূজন বাহিত হইয়া ভাবুকের কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে; মুহূর্তের পর মুহূর্ত নূতন হইতে নূতনতর পুলকের ধারা বহিয়া আনিতেছে।[৩২]

৩.এই যে অসীমের সন্ধানী কবি-প্রতিভা, যাহা যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়া কালের বক্ষে পুনঃ পুনঃ প্রস্ফুটিত হইয়া বিশ্ব-মানবকে হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে, মরমে পশিয়া অন্তরের অন্তঃস্থলকে আকুল করিতেছে, পারস্য-প্রসূন হাফিযে তাহারই এক অভিনব বিকাশ। মানব চিরকালই ভাবের উপাসক। কবি সেই ভাবরাজ্যের শিল্পী। ভাব লইয়াই তাঁর লীলা খেলা। তাই কবিতা কখনও পুরাতন হয় না। চিরন্তন আত্মার ন্যায় উহা অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের প্রাণের সহিত আত্মীয়তা করিয়া আসিতেছে। তাই "কবিতা কালের সাক্ষী, কবিরা অমর"। আর এই বিশাল ভাবরাজ্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতম, হাফিয সেই পারমার্থিক প্রেমের কবি। হাফিযের সমগ্র কাব্যের পত্রে প্রত্রে, ছত্রে ছত্রে একই সুর ঝঙ্কার দিতেছে।[৩৩]

এরূপ কবিত্ব ও ছন্দময়ী ভাবধারা *পারস্য প্রতিভা*-কে এক অনবদ্য সৃষ্টিতে পরিণত করেছে। *পারস্য প্রতিভা*-র আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এটি রচনার সময় বরকতুল্লাহ পারস্য সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে যেখানে বাঙালী কবির রচনার সাথে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন সেখানে তা উল্লেখ করেছেন। কবি হাফিজের জীবন ও সাহিত্য কর্ম আলোচনায় বরকতুল্লাহ একাধিক বাঙালী কবির প্রসঙ্গ এনেছেন। ফারসী কবিদের মাঝে হাফিজ বাংলার পাঠক সমাজকে বেশী আকৃষ্ট করে। গৌড়ের বিদ্যোৎসাহী সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯) তাঁর কবিত্বের খ্যাতি শ্রবণে তাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান। কবির আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বার্ধক্য ও পথের দূরত্বের সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। নিজের অক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করে তিনি সুলতানকে এক মনোহর কবিতায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। কবিতাটি তাঁর *দিউয়ান* কাব্যে স্থান লাভ করে। ঐ কবিতায় তিনি লেখেন "হিন্দুস্থানের তোতাপাখীরা মিষ্টিমুখ হইবে এই মিছরীখণ্ড হইতে, যাহা আজ বাঙ্গলা দেশে যাইতেছে। হাফিজ, তুমি সুলতান গিয়াসউদ্দীনের মজলিশে দাখিল হইবার বাসনা হইতে নিরস্ত হইওনা। কেননা উক্ত বাসনাই কর্মকে (সাধনাকে) ঠিক পথে চালাইয়া লইবে।"[৩৪]

হাফিজ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বরকতুল্লাহ্ চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ ও মধুসূদনের কথা উল্লেখ করেছেন। হাফিজ যখন সঙ্গীতে পারস্যের সাহিত্য কানন মুখরিত করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বঙ্গ কবি চণ্ডীদাস আপনার বীণায় সুরালাপ মগ্ন। যেখানে হাফিজ বলেছেন,

"ঢাল সুরা সখি! সাজাও পেয়ালা সরম আছে কি তায়।
প্রেমের মরম তারা কি জানে লো 'ধরম' যাহারা চায় ॥"[৩৫]

চণ্ডীদাসের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়

"মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি, তাদের কথায়! বাহিরে রহুন তারা।"[৩৬]

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩২ সালে এপ্রিল মাসে পারস্য ভ্রমণকালে সিরাজনগরে হাফিজের সমাধিতে অর্ঘ্য প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে বরকতুল্লাহর মনে পড়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁর সমাধি গাত্রে মর্মস্পর্শী ভাষার কথা,

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষন কাল।"[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের সমাধিতে লিপিবদ্ধ ছত্রটি দর্শকের প্রাণের ভিতর তেমনি ধ্বনিয়া ওঠে

"মোর সমাধি শিয়র দিয়া যেতে
(খোদার) আর্শীবাদ চেয়ো পান্থ তুমি;
এ ধরণীর শাস্ত্রচ্যুত যারা তাঁহাদের হবে তীর্থ ভূমি।"[৩৮]

ওমর খৈয়ামের রচনারীতির পরিচয় দিতে গিয়ে বরকতুল্লাহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এনেছেন, রচনাভঙ্গীতে (style) ওমরের তুলনা অনেকটা বর্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথ। সোজা কথায়; একটী মাত্র শব্দে; একটী মাত্র ইঙ্গিতে, পাঠকের মর্মের ভিতর লুকায়িত তারটিকে বাজাইয়া তোলা বোধ হয় অন্য কেহ এমন পারেন নাই।[৩৯] বরকতুল্লাহ এভাবে পারস্য প্রতিভার সাথে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, নবীগৃহ সংবাদ, গ্রন্থকারের নিবেদন, পৃ. ৩

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪. বেগম নার্গিস জেরিনা খান, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রাঃ),পৃ. ৩৪

৫. বরকতুল্লাহ, নবীগৃহ সংবাদ, পৃ. ৪৫

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৮. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, নবী জীবনী রচয়িতা বরকতুল্লাহ, মাসিক পূর্বাচল, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৮৫, ঢাকা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, কে, জি, মোস্তফা, পৃ. ২

৯. লেখকের নিবেদন, হযরত ওসমান, বরকতুল্লাহ (৩য় খণ্ড) পৃ.১৮১

১০. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, হযরত ওসমান, পৃ. ২০৫

১১. Ibid, পৃ. ৪৬

১২. হযরত ওসমান, প্রাগুক্ত পৃ. ২৫৭

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

১৭. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

১৮. গোলাম সাকলায়েন, মুহম্মদ বরকতুল্লাহ (জীবনী গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ১৯

১৯. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯৭

২০. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

২১. আবদুস সাত্তার, ফারসী সাহিত্যের কালক্রম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৭৯, পৃ. ১৩

২২. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, পারস্য প্রতিভা, মুখবন্ধ, ৬ষ্ঠ যুক্ত সংস্করণ, ১৯৬৫, প্রকাশক, মোহম্মদ আসাদুল্লাহ, ঢাকা

২৩. পারস্য প্রতিভা, বরকতুল্লাহ (১ম খণ্ড) পৃ. ১৯৮

২৪. ভূমিকা, পারস্য প্রতিভা, বরকতুল্লাহ (১ম খণ্ড) পৃ. ৮

২৫. ড. শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী, ইরান ও ইসলাম (মুহম্মদ মমতাজ উদ্দীন অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯, পৃ. ১২৩

২৬. ভূমিকা, পারস্য প্রতিভা, বরকতুল্লাহ (১ম খণ্ড), পৃ. ১৩

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

২৯. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, সাহিত্য সমীক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৩০. ভাষা শিল্পী বরকতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

৩১. শেখ সা'দী, পারস্য প্রতিভা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-৩৫

৩২. কবি ফির্দোসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৩৩. কবি হাফিয, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৩৪. কবি হাফিয, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

৩৮. কবি হাফিয, ঐ, পৃ. ২২৮

৩৯. ওমর খইয়াম, পারস্য প্রতিভা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য রচনায় যে সমস্ত মুসলিম সাহিত্যিক কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ অন্যতম। বরকতুল্লাহ্ তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনে সুদীর্ঘকাল সাহিত্য সাধনায়রত ছিলেন। তবে একথা সত্য যে প্রশংসনীয় লিপিকুশলতা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও তিনি বেশী লিখেন নি। কর্মজীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন ও পরিণত বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁর সাহিত্য চর্চায় ব্যাঘাত ঘটায়। তদুপরি লেখালেখির ব্যাপারে এক সময় সরকার পক্ষ থেকে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। এসকল কারণে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর সাহিত্য চর্চার সুযোগ হয়ে ওঠে নি।

বরকতুল্লাহ্ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রধান চিন্তাবিদদের একজন। তাঁর রচনার পরিমাণ বেশী না হলেও নানা ধর্মী লেখায় তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিকে যেমন সাহিত্য সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তেমনি তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস। বরকতুল্লাহর অমর গ্রন্থ *পারস্য প্রতিভার* মাধ্যমে পারস্য সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, পারস্যের উল্লেখযোগ্য কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক সম্পর্কে তিনি যে আলোচনামূলক ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন তাতে পারস্য সাহিত্য সম্পর্কে বাঙ্গালী সাহিত্য মোদীদের জানার ব্যাপক সুযোগ করে দিয়েছে।

মানুষের ধর্ম্ম বরকতুল্লাহর একটি উল্লেখযোগ্য দার্শনিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে আমরা বরকতুল্লাহকে একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক হিসেবে দেখতে পাই। *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে লেখক জীবন-জগৎ, ইহকাল-পরকাল, আত্মা-পরমাত্মা, জড়-প্রকৃতি মনোজগৎ প্রভৃতি দুরূহ ও জটিল বিষয় নিয়ে দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা করেছেন। *মানুষের ধর্ম্ম* গ্রন্থে দর্শনের মতো জটিল বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েও লেখক তাঁর ভাষাকে করেছেন সরল ও সুখপাঠ্য।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের পর বরকতুল্লাহর সাহিত্যকর্মে অনেকটা ভাটা পড়েছিল। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী সময় পর্যন্ত তিনি সাহিত্য অংগনে একপ্রকার নিষ্ক্রিয় ছিলেন বলা যায়। অতঃপর ১৯৫৭ সালে তাঁর *কারবালা* গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে সাহিত্য সাধনায় তাঁর নতুন মাত্রা যোগ হয়। এ পর্বে তাকে আমরা দেখতে পাই সাহিত্য সমালোচক ও দার্শনিকের পথ থেকে ভিন্ন পথে ইতিহাসের ভষ্যকাররূপে। *কারবালা* গ্রন্থটি পরবর্তীতে *কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থ নামে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি কারবালার হৃদয় বিদারক হত্যা কাহিনী এবং পরবর্তী সময়ে ইমাম বংশের বিষাদময় পরিণাম সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জীবন চরিত রচনা করেন। এখানে বরকতুল্লাহ ইতিহাস বিবৃতিকার ও জীবনীকার হিসেবে সাহিত্য অংগনে আত্মপ্রকাশ করেন।

বরকতুলাহ মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাতে নবী পত্নী এবং সাহাবীদের নামের শেষে তিনি কোথাও রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু এর সংক্ষিপ্ত রূপ (রাঃ) বাক্যটি উল্লেখ করেন নি। অথচ ইসলামী রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী সাহাবীদের নামের সাথে (রাঃ) বাক্যটি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কেননা পবিত্র কোরআনে সূরা বায়্যিনায় সাহাবীদের সম্পর্কে মহান আলাহ রাব্বুল আলামীন উল্লেখ করেছেন, "আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাঁহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট। ইহা তাহার জন্য, যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।" এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবীরা ছিলেন মহান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণভাবে সন্তোষ্ট ও আস্থাশীল এবং সাহাবীদের প্রতিও মহান আল্লাহ রাজী-খুশী ছিলেন। তাই সাহাবীদের নামের সাথে (রাঃ) বাক্যটি যুক্ত থাকাই সমীচিন। কিন্তু বরকতুল্লাহ কেন সাহাবীদের নামের শেষে (রাঃ) বাক্যটি উল্লেখ করেন নি, এ সম্পর্কে তাঁর কোন বক্তব্য বা মন্তব্য পাওয়া যায় নি। উক্ত অভিসন্দর্ভ রচনায় অনেক ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আয়াতের অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত আল্-কুরআনুল করীম থেকে আয়াতের অর্থ নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিজীবনে বরকতুল্লাহ ছিলেন মানবতাবাদী। তিনি আপন সম্প্রদায়ের অধঃপতিত মানুষদের কিভাবে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া যায় তা যেমন ভেবেছেন তেমনি সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের কথাও ভেবেছেন। স্কুল জীবন থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যেমন খেদমত করেছেন তেমনি মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেও লালন করেছেন। সর্বোপরি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুণের জন্য সাহিত্য সাধক হিসেবে বরকতুল্লাহ আমাদের জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ক. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর মৃত্যু পরবর্তী সমালোচনা, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক, কারবালা গ্রন্থের ভাষ্যকার, পারস্য প্রতিভার জন্য খ্যাত মোহম্মদ বরকতুল্লাহ ২ নভেম্বর, ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশব্যাপী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি সমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে। দেশের পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত হয় প্রতিক্রিয়া। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

(১)

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ আজ আমাদের মধ্যে নাই। বিগত শনিবার ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। মোহম্মদ বরকতুল্লাহর তিরোধানকে অকাল বিয়োগ বলা চলে না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে সাহিত্যের ও বুদ্ধিজীবী সমাজের যে ক্ষতি সাধিত হল, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ নিজে তাঁর উত্তরাধিকারের সঠিক দায়িত্ব পূরাপুরিভাবেই পালন করে গেছেন। দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন আজীবন। আর সেই সরকারী দায়িত্বের ফাঁকে তিনি সাহিত্য চর্চা করে গেছেন। তবে "চর্চা" শব্দটা তাঁর বেলায় প্রয়োগ না করাই ভাল, বরং 'সাহিত্য সাধনা' কথাটাই তাঁর জন্য উপযুক্ত। এমন এক সময় ছিল যখন তাঁর পারস্য প্রতিভা শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা কুড়িয়েছিল। সাহিত্যের ইতিহাসও যে সাহিত্য হতে পারে, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র সাধনা তা প্রমাণ করেছে। অধ্যাপক ই.জি ব্রাউনের

Dhaka University Institutional Repository

"লিটারারী হিষ্টরী অব পারশিয়া" অনেকেই পড়েছেন। কিন্তু ওই পান্ডিত্যপূর্ণ সুবিশাল গ্রন্থ হার মেনে গেছে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দু'খন্ডে সমাপ্ত নাতিদীর্ঘ 'পারস্য প্রতিভার' কাছে।

(দৈনিক ইত্তেফাক, উপ-সম্পাদকীয়, ৫.১১.৭৪)

(২)

প্রবীণ সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ গতকাল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নলিল্লাহে ----- রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর। তিনি সৃজনশীল লেখক ছিলেন না, আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিলো একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে। তাঁর অসামান্য গ্রন্থ পারস্য প্রতিভা একদা সারস্বত সমাজে আশ্চর্য সাড়া জাগিয়েছিলো। এই গ্রন্থের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর ভাষা। পারস্য প্রতিভায় মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ ফারসী সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন সুললিত গদ্যে। তিনি পরিশীলিত গদ্যরীতির অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর রচনা সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলো সেকালে। প্রশংসা-কৃপণ সমালোচকদেরও তিনি মজিয়েছিলেন তাঁর বক্তব্যের ঋজুতায়, রচনার প্রসাদগুণে। পারস্য প্রতিভার ঔজ্জল্য সহজে ম্লান হওয়ার নয়।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ আগ্রহ শুধু সাহিত্যে সীমিত ছিলো না, দর্শন-চর্চাতেও তিনি প্রবল উৎসাহী ছিলেন। এই উৎসাহের প্রসুন তাঁর মানুষের ধর্ম নামক গ্রন্থ। হাল্কা বিষয় নিয়ে তিনি কখনো মেতে ওঠেননি, গুরুগম্ভীর বিষয়ই তাঁকে ভাবিয়েছে সব সময়। যাকে বলে জনপ্রিয় লেখক তা তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। তাঁর অনুরক্ত ভক্তের সংখ্যা বিরল। কিন্তু যাঁরা তাঁর রচনাশৈলীর অনুরাগী তাঁদের সাহিত্য রুচি নিঃসন্দেহে উন্নতমানের।

কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর আচরণে কখনো কোনা পদগরিমা প্রকাশ পেতো না। আড়ালেই থাকতে ভালো-বাসতেন তিনি। বস্তুত তিনি ছিলেন প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। গুণীর বিনয় ছিলো তাঁর চরিত্রে। বুঝি তাই তিনি কখনো নিজেকে

Dhaka University Institutional Repository

জাহির করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেনটি। সভাসমিতিতে তাঁকে খুব একটা দেখা যেত না। কালেভদ্রে দেখা গেলেও তাঁর উপস্থিতি তেমন দৃষ্টিগোচর হতো না। তাঁর আগমন ও নির্গমন অত্যন্ত নিঃশব্দ ও প্রচ্ছন্ন ছিলো বলেই মনে হতো, সভায় তিনি থেকেও যেন নেই।

দুঃখের বিষয়, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ বেশী লিখেননি। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা খুবই কম। প্রশংসনীয় লিপিকুশলতার অধিকারী হয়েও কেন তিনি আরো বেশী লিখলেন না- এই ক্ষোভ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অনুরাগীদের মনে জেগে থাকে। এই ক্ষোভ আমাদেরও। কিন্তু তিনি আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন, সেজন্যেই তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁর মৃত্যুতে এখানকার প্রবন্ধ সাহিত্যে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ মৃত্যুতে আমরা শুধু একজন শক্তিমান লেখককেই হারাইনি, হারিয়েছি একজন প্রকৃত সজ্জনকেও। আমরা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানাই আমাদের সমবেদনা।

(দৈনিক বাংলা, সম্পাদকীয়, ৩.১১.৭৪)

(৩)

মৃত্যু আর একজন প্রবীণ সাহিত্যিক, কুশল লিপিকারকে আমাদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিল। পারস্য প্রতিভা'র লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাব মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ গত শনিবার ছিয়াত্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ---- রাজেউন)। বাঙ্গালী মুসলিম জাগরণের মুখে চিন্তাশীল প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে। সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল। সুললিত গদ্যের যে স্বল্প পরিসরে ক্লাসিক্যাল ফারসী সাহিত্যের সঙ্গ তিনি বঙ্গালী সমাজকে পরিচিত করেছিলেন তা সত্যই

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ময়কর। তাঁর রচনায় বিধৃত অন্তদৃষ্টি, সৌন্দর্যানুভূতি ও লিপিকুশলতার গুণে তিনি সাহিত্য রসিকজনের হৃদয় এক মুহূর্তে জয় করে নিয়েছিলেন।

সুদীর্ঘ ছিয়াত্তর বছরের জীবন পরিধির তুলনায় সংখার দিক থেকে তাঁর সাহিত্য-কর্ম হয়তো খুব বেশী নয়, তবু সুললিত গদ্যে যে কয়টি তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ মননশীল গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, তার ভেতর দিয়েই তিনি এ দেশের সাহিত্য রসিকজনের মনে বেঁচে থাকবেন। বিনয় নামক এক দুর্লভ গুণের অধিকারী এই মানুষটি কখনোই নিজেকে জাহির করতে চাইতেন না। নীরবে লোকচক্ষের অন্তরালেই তিনি থাকতে ভালবাসতেন। কোন কোন অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকলেও সেই উপস্থিতি হতো নিঃশব্দ, প্রচ্ছন্ন, সকলের মাঝে থেকেও যেন তিনি নেই। মৃদু, মিষ্টি-ভাষী প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে আমরা একজন শক্তিমান লেখক এবং প্রকৃত সজ্জনকে হারিয়েছি। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাই।

(দৈনিক পূর্বদেশ, সম্পাদকীয়, ১৭ কার্তিক ১৩৮১)

(৪)

গত শনিবার ৭৬ বছর বয়সে প্রবীণ সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্‌ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নলিল্লাহে ---- রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি চার ছেলে ও ছয় মেয়ে রেখে গেছেন। এবং রেখে গেছেন অসংখ্য ভক্ত গুণগ্রাহী এবং অনুরাগী বন্ধুবান্ধব ও স্বজন প্রতিবেশী। আমরা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

বলা বাঞ্চনীয় যে, তাঁর শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও সাহিত্য জীবন সুধীজনের কাছে প্রশংসা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছে প্রেরণাব্যঞ্জক। কর্মজীবনের গুরুদায়িত্বের মাঝেও যেন তাঁর সাহিত্যপিপাসু মন নিষ্ঠা, সাহিত্যানুরাগ ও অদম্য নিরলস সাধনার জগতে বিচরণ করে

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দ পেত। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়- বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে জানতেও তিনি ছিলেন সদা উৎসুক। মরহুম বরকতুল্লাহর অমর গ্রন্থ 'পারস্য প্রতিভা' তারই সাক্ষ্য। এই গ্রন্থে তিনি পারস্য প্রতিভাধরদের সঙ্গে বাঙালী সুধী সমাজের আত্মিক যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে কয়েকজন মুসলিম প্রতিভাধর স্বীয় প্রতিভা বলে বাংলা গদ্য সাহিত্যের আসরে নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে মরহুম বরকতুল্লাহ অন্যতম। তাঁর গদ্য ভাষা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, বক্তব্য ভঙ্গী ঋজু, ব্যাখ্যায় পরিচ্ছন্ন, বর্ণনায় সাবলীল ও মনোরম, যুক্তিতে শাণিত এবং উপস্থাপনায় আকর্ষণীয়। সৃজনশীল সাহিত্যরচয়িতা তিনি ছিলেন না বটে, কিন্তু চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি সুধী সমাজকে চকিত করতে যে পেরেছিলেন সে কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

মরহুম সাহিত্যিক বরকতুল্লাহ দর্শন চর্চাও করতেন। 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে তাঁর দার্শনিক চিন্তার অত্যন্ত বিচক্ষণ বক্তব্য সেই প্রমাণই বহন করে। সাহিত্য রচনার বিষয় নির্বাচনে তিনি ছিলেন সর্বদা গুরু ও গম্ভীর। তাই হয়ত তাঁর পাঠক সংখ্যা বেশী ছিল না। কিন্তু বুদ্ধিজীবী মহলে তার কদর ছিল অসামান্য। এও সত্য যে, প্রতিভার তুলনায় তিনি কম সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন। হয়ত আজীবন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে কাজ করাই তার মূলে রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। আত্মপ্রচার পছন্দ করতেন না। বলা যায়, নিরহঙ্কারী ও জ্ঞানানুরাগী এই সাহিত্যিক তাই সার্বিকভাবেই ছিলেন আমাদের জাতীয় গৌরব ও সম্পদ। বাংলাদেশে সাহিত্যাঙ্গন থেকে এহেন উচ্চ পর্যায়ের চিন্তাশীল ও খ্যাতিমান একজন সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিককে হারিয়ে সমগ্র দেশ এবং সাহিত্য সমাজ আজ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হল। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুণের জন্য সাহিত্যকৃতী ও সাধক হিসেবে তিনি আমাদের জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে অমর ও অনুসরণীয় হয়ে থাকুন- তাঁর সমগ্র জীবনের সৎ জীবনযাত্রা ও কর্মের পুরস্কার হোক এইটে। আমরা ঐকান্তিকভঅবে তাই কামনা করি।

(দৈনিক বাংলার বাণী, সম্পাদকীয় ১৭ কার্তিক, ১৩৮১)

Dhaka University Institutional Repository

খ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর গ্রন্থাবলী

১. পারস্য প্রতিভা (১ম খণ্ড- ১৯২৪, ২য় খণ্ড- ১৯৩২)

২. মানুষের ধর্ম্ম (১৯৩৪)।

৩. কারবালা (১৯৫৭)।

৪. নবী গৃহ সংবাদ (১৯৬০)।

৫. নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ (১৯৬৩)।

৬. হযরত ওসমান (১৯৬৯)।

গ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর অগ্রন্থিত রচনাবলী

১. পদ্মাবক্ষে- রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিন, সেপ্টেম্বর ১৯১৬।

২. ভগ্নদেউল- রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিন, মার্চ ১৯১৭।

৩. ছাত্রসমাজে জাতীয়তা- আল এছলাম, মাঘ ১৩২৪।

৪. অর্ঘ্যভার (কবিতা) [এম, আনসারী ছদ্মনামে রচিত]-আল এছলাম, ফাল্গুন, ১৩২৪।

৫. ক্রুসেডের পরিণাম- বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩২৫।

৬. ওমর খাইয়াম- বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩২৬।

৭. ক্রুসেডের পরিণাম (ধর্ম্ম-তত্ত্বে) মোসলেম ভারত, বৈশাখ, ১৩২৭।

৮. পারস্য সাহিত্য -মোসলেম ভারত, আষাঢ় ১৩২৭।

৯. শেখ সাদী- মোসলেম ভারত, শ্রাবণ ১৩২৭।

১০. মানুষের ধর্ম্ম-মোসলেম ভারত, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৭।

১১. ধ্রুব কোথায়- সওগাত, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ১৩২৭।

১২. শক্তিসাধনা-মোসলেম ভারত, ভাদ্র ১৩২৮।

১৩. হুগলীর ইমামবাড়ী- মোসলেম ভারত, আশ্বিন ১৩২৮।

১৪. সভ্যতার জের-মোসলেম ভারত, কার্তিক ১৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. সাহিত্যে বৈচিত্র্য (এম. আনসারী ছদ্মনামে)- বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিক, কার্তিক, ১৩২৮।

১৬. মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী-অগ্রহায়ণ এবং পৌষ, ১৩২৮।

১৭. তপোবল (এম. আনসারী ছদ্মনামে) -বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিক, মাঘ, ১৩২৮।

১৮. 'মতিচুর ২য় খণ্ড'-পুস্তক পরিচয় (আনসারী ছদ্মনামে)- মোসলেম ভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

১৯. মানুষের ধর্ম্ম-নূর, ফেব্রুয়ারী, ১৯২০।

২০. কবি-সংবর্দ্ধনা (এম. আনসারী ছদ্মনামে) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিক, বৈশাখ, ১৩২৯।

২১. জাতি বড় হয় কিসে-সহচর, আশ্বিন, ১৩২৯।

২২. মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর দেহত্যাগ- বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৯।

২৩. সাম্যবাদ-সাম্যবাদী, পৌষ, ১৩৩০।

২৪. বিবি খোদিজা-সওগাত, ফাল্গুন, ১৩৩২, বৈশাখ, ১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

২৫. তৈমুর- সওগাত, মাঘ, ১৩৩৩।

২৬. জীবন প্রবাহ-সাহিত্যিক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪, শ্রাবণ, ১৩৩৪ ও ভাদ্র, ১৩৩৪।

২৭. হাল ও মকাম-সওগাত, আষাঢ়, ১৩৩৪।

২৮. পারস্য কবি মুয়িজ্জী ও আনোয়ারী- সওগাত, শ্রাবণ, ১৩৩৪।

২৯. ইসমাইলী মতবাদ-সওগাত, আশ্বিন, ১৩৩৪।

৩০. নাসির খসরু-সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ও পৌষ, ১৩৩৪।

৩১. মানুষ তৈরীর পন্থা-মোয়াজ্জীন, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৩৫।

৩২. ধ্বংসাবশেষ--মোয়াজ্জীন, আষাঢ়-চৈত্র, ১৩৩৫।

৩৩. মহাকবি আত্তারের শেষ জীবন- সওগাত, শ্রাবণ, ১৩৩৫।

৩৪. রবীন্দ্রকাব্য পাঠ (গ্রন্থসমালোচনা)-জাগরণ, কার্তিক, ১৩৩৫।

৩৫. মহাকবি আত্তারের যুগ- সওগাত, মাঘ, ১৩৩৫।

৩৬. ইসলাম ও চীন- মোয়াজ্জীন, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. ইসলাম ও সভ্যতা-সওগাত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

৩৮. ইসলাম ও মুক্তবুদ্ধি- সওগাত, ফাল্গুন, ১৩৩৬।

৩৯. উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-রাহবার, বৈশাখ, ১৩৬৮।

৪০. নজরুল ইসলাম-নজরুল একাডেমী পত্রিকা, নবপর্যায় ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৩।

ঘ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর গ্রন্থভূক্ত প্রবন্ধসমূহ

১. ফারসী সাহিত্য-'পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত, ১৯৫৪।

২. গোলাম মোস্তফা স্মরণে- 'কবি গোলাম মোস্তফা' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪।

৩. দর্শনে মুসলমান ঃ ভূমিকা- 'দর্শনে মুসলমান গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত, ১৯৬৯।

৪. আল-ফারাবী-'দর্শনে মুসলমান' ১৯৬৯।

৫. ইবনে সিনা- 'দর্শনে মুসলমান', ১৯৬৯।

৬. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ-'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।

৭. মাওলানা এছলামাবাদী-'মওলানা এছলামাবাদী' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত, ১৯৭১, [ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত কথিকা]।

ঙ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর অভিভাষণ

১. ৩০ মার্চ ১৯৩৪ অনুষ্ঠিত 'ঢাকা মুসলিস সাহিত্য সমাজ' এর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

Dhaka University Institutional Repository

২. ৮-৯ মে ১৯৪৩ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তত্ত্বাবধানে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ৭ম অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতির ভাষণ ['ছায়াবীথি' বৈশাখ ১৩৪১ সংখ্যায় মুদ্রিত]।

৩. অক্টোবর ১৯৫২ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাহিত্য অধিবেশনে গদ্য শাখার সভাপতির ভাষণ।

৪. ২৭ জানুয়ারী ১৯৫৬ বরিশালে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ।

৫. ২-৪ মে ১৯৫৮ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত ভাষণ ['মাসিক মোহাম্মদী' আষাঢ় ১৩৬৫ সংখ্যায় মুদ্রিত]।

৬. ১৯৬১ এর এপ্রিল মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইন্দো-পাকিস্তান কালচারাল কনফারেন্সে পঠিত প্রবন্ধ Education in Pakistan.

চ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর অপ্রকাশিত রচনাবলী

১. কতিপয় কবিতা (রচনাকাল ১৯১৬-১৯)

২. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (রচনাকাল অজ্ঞাত)।

৩. ডাঃ লুৎফর রহমান (রচনাকাল অজ্ঞাত)।

৪. নবযুগের আহ্বান (রচনাকাল অজ্ঞাত)।

Dhaka University Institutional Repository

ছ. মোহম্মদ বরকতুল্লাহর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তৎকালীন সময়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা

পারস্য প্রতিভা-১ম খণ্ড

(১)

এই পুস্তকে ফের্দ্দৌসী, হাফেজ, ওমর খইয়াম, সা'দী ও জালালউদ্দীন রুমী- এই কয়জন পারস্য কবির জীবন কথা আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। ** আলোচনা এবং বিশ্লেষণের ভাষা সর্ব্বত্রই গম্ভীর অথচ মধুর, সারগর্ভ অথচ সরস,-কোথাও কষ্ট কল্পনার আভাসমাত্র নাই-ভাষা সর্ব্বত্রই সরল স্বচ্ছন্দ গতিশালিনী এবং সহজ ভঙ্গীময়ী। কার্লাইলের "হিরো ওয়ার্শিপ" প্রভৃতি গ্রন্থে যেরূপ অন্তর্দৃষ্টিশীলতা এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট,-রাস্কিনের গ্রন্থে কারুশিল্প-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যানুভূতির যেরূপ মনোমদ চিত্র দেদীপ্যমান, এই 'পারস্য প্রতিভা' গ্রন্থের গ্রন্থাকারেরও সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিশীলতা এবং সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রোজ্জ্বল পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থাকার যে একাধারে কবি, ভাবুক এবং জীবনী আলেখ্যের সুপটু চিত্রকর, তাহা এই গ্রন্থে উত্তমরূপেই বুঝা যাইবে। এ পুস্তক একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, -আবার-আবার পড়িবার ইচ্ছা হয়। আর, কবি ফের্দ্দৌসী প্রভৃতির জীবন-সমালোচনা পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারের কবিত্বময়ী আবেগময়ী ছন্দময়ী মধুময়ী ভাষায় আত্মহারা হইয়া মহা-প্রকৃতির কবিত্ব-কোলে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা জন্মে। এইরূপ কবিত্ব-লীলাভঙ্গীময় ভাব-মাধুর্য্য-মনোহর এবং মহাকবি ও মহাপ্রাণের জীবনী আলোচনাপূর্ণ পুস্তকই এ দেশের উচ্চশ্রেণীর অধ্যয়ন এবং অলোচনার জন্য পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার ভাষার একাংশের একটুকু নমুনা পাঠককে দেখাইব,-

"হাফেজ যখন আপনার অপার্থিব সঙ্গীতে পারস্যের সাহিত্য কানন মুখরিত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বঙ্গের এই শ্যামলকুঞ্জ মধুময় করিয়া একজন বঙ্গকবি আপনার বীণায় সুরালাপ করিতেছিলেন। ইনি বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস। মহা এশিয়ার দুই বিভিন্ন কোণে দুই সাধক একই সুরের আলাপন করিতেছিলেন। যেখানে হাফেজ বলিয়াছেন-

Dhaka University Institutional Repository

ঢাল সুরা সখি! সাজাও পেয়ালা, সরম আছে কি তায়।
প্রেমের মরম তারা কি জানে লো ধরম যাহারা চায়॥

সেখানে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন-

মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা,
কাজ নাই সখি, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা।

ঠিক হাফেজের মতই চন্ডীদাসও গাহিতেছেন-

বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।

আবার অন্যত্র-

তোরা নিসাড় হইয়া চুপে চুপে আয়,-
দেখিবি, সেই আলোর মাঝারে কালো।

"আবার বহুকাল পরে আজ রবীন্দ্রনাথেও ঐ সুর নবপ্রাণ লাভ করিয়াছে। এ সুর যে নিত্য, চিরস্থায়ী, উহা নব-রসের প্রবাহে রসময় নহে ;-ষড়রিপুর লীলা বৈচিত্রেও উহা অপরঞ্জিত নহে ; উহা ক্রোধরূপে হৃদয়কে দগ্ধীভূত করিয়া অঙ্গাররূপে নিঃশেষ রাখিয়া যায় না; লালসা-জড়িত প্রবৃত্তির ন্যায় হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া আবার উহাকে মূর্চ্ছিত ও অবসন্ন অবস্থায় ফেলিয়া যায় না ; প্রীতি বা স্নেহের ন্যায় সময়ে সময়ে জাগরিত হইয়া মূহুর্তের জন্য হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়া আবার মরুভূমে মিলাইয়া যায় না ; পরন্তু উহা অন্তসলিলা ফল্গুর ন্যায় মৃদু-কলনাদে ভক্তের প্রাণের-গোপন প্রদেশে আবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, নিত্য সনাতন মহা-মিলনের পানে অনাহত ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে, তরঙ্গে তরঙ্গ অপূর্ব মূর্চ্ছনায় উদ্বোধন করিয়া ভক্তের প্রাণ বিভোর করিতেছে। হাফেজ সেই পারমার্থিক প্রেমের উপাসক ছিলেন।"

এইরূপ সুর পুস্তকের প্রায় সর্ব্বত্রই ** এ পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য। পারস্যের কাব্য-মালঞ্চের কবি-কোকিলগণের মধুর স্বরে এবং তদধিক সুমধুর সার-তত্ত্বে যাঁহারা নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারা এই "পারস্য-প্রতিভার" পুস্ত কে সে আস্বাদ প্রচুর পরিমাণেই পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মুসলমান গ্রন্থকারগণের

Dhaka University Institutional Repository

ভিতর যে এমন চিন্তশীল এবং সুমধুর অথচ প্রাঞ্জল বঙ্গভাষার লেখক আবির্ভূত হইতেছেন- ইহাও বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে অতীব আনন্দ ও আশার কথা। "পারস্য-প্রতিভার" গ্রন্থকার মহাশয়ের লেখনী জয়যুক্ত হউক; তাঁহার সুধা-নিস্যন্দিনী লেখনী পারস্য কাব্য-সাহিত্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমনই সুধারস গ্রন্থাকারে প্রদান করিতে রহুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

[বঙ্গবাসী, ১৮ ফাল্গুন, ১৩৩০]

(২)

পারস্য প্রতিভা-পারস্য কবিদের জীবন ও কাব্যালোচনা, প্রথম খন্ড। শ্রী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ এম.এ.বি.এল-প্রণীত। রায় এন্ড রায়চৌধুরী, ২৪ দোতলা কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ১৮১ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা, সোনালিতে নামলেখা। পাঁচ সিকা। ১৩৩০।

এই পুস্তকে পারস্য সাহিত্যের একটি মোটামোটি পরিচয় এবং ফির্দ্দোসী হাফিজ ওমর খইয়াম সাদী ও জালালুদ্দীন রুমীর জীবনী ও কাব্যালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে;

গ্রন্থকার নিজের জ্ঞান ও বিচারের সহিত বহু পাশ্চাত্য পন্ডিতের গবেষণার সংমিশ্রণে এই উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ধর্ম্মে ও সাহিত্যে জাতিভেদ নাই; স্থান ও কালের বিভিন্নতায় ধর্ম্মে ধর্ম্মে সাহিত্যে-সাহিত্যে যে পার্থক্য ঘটে তাহাতে অসীম-রস-পিপাসু মানবগণ বিভিন্নতার রসাস্বাদ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবার অবসর পায়। গ্রন্থকার এই অসাধারণ আনন্দ বঙ্গের নর-নারীকে পরিবেশন করিয়া সকলের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কবির জীবনের সহিত তাঁহার কাব্যের সম্পর্ক প্রদর্শন ও তাঁহার কব্যের বিশেষত্ব নিশ্লেষণ বিশেষ নিপুণতার সহিত করা হইয়াছে। কেবল একটী অভাব আমাকে দুঃখ দিতেছে, তাহা এই- লেখক বলিয়াছেন "পার্শীভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠককে কবির রচনা-ভঙ্গী বুঝাইবার উপায় নাই। বঙ্গ ভাষায় সে সৌন্দর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা।" এই জন্য লেখক রচনার নমুনা মূল পার্শী হইতে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত না করিয়া কেবলমাত্র তাহার ইংরাজী বা বাঙ্গলা অনুবাদ দিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তৃপ্তিবোধ হয় না। মূল বুঝিতে না পারিলেও তাহার শব্দ ঝঙ্কার শুনিবার জন্য উতলা হইয়া উঠে। গ্রন্থকার মূল কবিতাগুলিও বাঙ্গলা অক্ষরে অক্ষরে লিখিয়া দিলে এই গ্রন্থের মূল্য বর্দ্ধিত হইত।

স্থানে স্থানে গ্রন্থকার পার্সী শ্লোক বাংলা অক্ষরে লিখিয়াছেন; কিন্তু অক্ষরান্তকরীকরণ সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ হয় নাই। গ্রন্থকারের পদ্যানবাদও সর্ব্বত্র ছন্দ ও ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। এই ত্রুটী সত্ত্বেও বইখানি সাহিত্যরসিক ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সমাদৃত হইবে এবং সেরূপ হওয়ার যোগ্যতাও ইহার নিজের আছে।

[প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩১]

পারস্য প্রতিভা - ২য় খণ্ড

(১)

পারস্য প্রতিভা-মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ এম.এ, বি.এল, বি.সি.এস. প্রণীত। প্রকাশক- ডাক্তার মোহাম্মদ আখতার হোসেন, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য পাঁচ সিকা। দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম সংস্করণ মূল্য ঐ।

পারস্য প্রতিভা প্রথম খন্ডের ইতিমধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় পুস্তকখানি কিরূপ লোকপ্রিয় হইয়াছে। ইহাতে পারস্য-সাহিত্য, কবি ফির্দ্দৌসী, ওমর খইয়াম, সেখ সা'দী, কবি হাফেজ ও জালালুদ্দীন রুমী এই ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। লেখকের ভাষা চমৎকার, গতি সাবলীল। ইদানীং মুসলমানী বাংলার মরশুমের মধ্যে এরূপ সাহিত্যরচনা বাস্তবিকই সাহসের পরিচয়।

Dhaka University Institutional Repository

পারস্য প্রতিভা, দ্বিতীয় খন্ডে পারস্যের উর্ব্বর যুগ, ফরিদউদ্দিন আত্তার, নাসির খসরু ও ইসমাইলী মত, নেজামী, জামী, সুফীমত ও বেদান্ত, সুফীমত ও নিও-প্লেটোনিজম-এই সাতটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতম খন্ডে যেমন পারস্য কবিদের ও তাঁহাদের কাব্যের পরিচয় মিলিবে, দ্বিতীয় খন্ডে তেমনি পারস্য দার্শনিক কবি-মণীষীদের জীবন ও মতামত আলোচিত ইহয়াছে। এই দুইখন্ড একত্রে পাঠ করিলে মধ্যযুগে পারস্যে যে অমর কাব্য দর্শন তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শিক্ষিত জনের পরিচয় হইবে। পারস্য প্রতিভা বাস্তবিকই বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

[প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৪]

(২)

বরকতুল্লাহ সাহেব কাব্যরসজ্ঞ ও চিন্তাশীল লেখক, এ কথা ১ম খন্ড 'পারস্য প্রতিভা' পড়িয়া সাহিত্য সমাজ স্বীকার করিয়াছিলেন। আলোচ্য দ্বিতীয় খন্ডও লেখকের সে যশ অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছে। এই খন্ডে আছে- (১) পারস্যের উর্ব্বর যুগ, (২) ফরিদউদ্দিন আত্তার, (৩) নাসির খসরু ও ইসমাইলী মত, (৪) নেজামী, (৫) সুফীমত ও বেদান্ত, এবং (৬) সুফীমত ও নিওপ্লোটোনিজম- এই ছয়টি প্রবন্ধ।

প্রথম প্রবন্ধ 'পারস্যের উর্ব্বর যুগে পারস্যের দার্শনিক চিন্তাধারার একটি আলোচনামূলক ইতিহাস দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যথার্থই খাটিয়া লেখা। ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে পারস্যের চিন্তাধারার তুলনামূলক সমালোচনাও স্থানে স্থানে সুন্দরভাবে করা হইয়াছে। লেখকের সহিত সকলে একমত হইতে পারুন বা না পারুন, তাঁহার আলোচনার সুন্দর প্রাঞ্জল পান্ডিত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে মুগ্ধ না হইয়া কেহ পারিবেন না।

'সুফীমত ও বেদান্ত' এবং 'সুফীমত ও নিও-প্লেটোনিজম' প্রবন্ধ দুইটও খাটিয়া লেখা ইহয়াছে। সুফীমত ও বেদান্তের মাঝে সাদৃশ্য থাকিলেও সুফীমত যে বেদান্তের অনুকরণ নহে, লেখক তাহা বহু যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্ত ও নিও-প্লেটোনিজমের সহিত

Dhaka University Institutional Repository

সুফীমতের পার্থক্য কোথায় লেখক তাহাও দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন। মতভেদ সত্ত্বেও সকলে এই প্রবন্ধ দু'টিও উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ধারণ।

অবশিষ্ট তিনটি প্রবন্ধও সুলিখিত। ফরিদউদ্দিন আত্তার, নাসির খসরু ও নেজামীর কাব্যজীবন এগুলিতে আলোচনা করা হইয়াছে। *** স্থানে স্থানে পারসী কবিতাংশের কাব্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের মতে কাব্যানুবাদ না দিয়া গদ্যানুবাদ দিলেই ভাল হইত। কারণ কাব্যানুবাদ প্রায় সব স্থানেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। মোটের উপর, মতভেদ সত্ত্বেও গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

[মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র, ১৩৩৯]

মানুষের ধর্ম্ম

(১)

বরকতুল্লাহ্ সাহেব একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক। এদিক দিয়ে তিনি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য- বোধহয় অদ্বিতীয়ও। আলোচ্য 'মানুষের ধর্ম্মে' তাঁর সুগভীর পান্ডিত্য ও দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। এ পুস্তকে 'মানুষের ধর্ম্ম', 'ধ্রব কোথায়', 'জড়বাদ', 'চৈতন্য', 'বস্তুরূপ' ও 'জীবন-প্রবাহ' এই ছয়টি প্রবন্ধ আছে।

বরকতুল্লাহ্ সাহেব 'পারস্য প্রতিভা' লিখে বাংলা সাহিত্যের একজন দার্শনিক ও কাব্যরসিক বলে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ পুস্তকখানা তাঁর অর্জিত খ্যাতি আরও প্রতিষ্ঠিত করবে। তাঁর ভাষার লীলাচাতুর্য্য, চিন্তার গভীরতা, নিপুন বিশ্লেষণশক্তি এ পুস্তকে তাঁর স্বকীয়ত্বকেই প্রমাণিত করেছে। এ পুস্তকখানা বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। আমরা এর যথেষ্ট প্রচার কামনা করি।

-বুজর-চে-মেহের

['মাসিক মোহাম্মদী', বৈশাখ, ১৩৪২]

Dhaka University Institutional Repository

(২)

এই পুস্তকখানি কয়েকটী দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি; প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ছয়টী প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে, মানুষের ধর্ম্ম, ধ্রব কোথায়, জড়বাদ, চৈতন্য, বস্তুরূপ ও জীবন প্রবাহ। প্রবন্ধগুলি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। সর্ব্বত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদের আলোচনা ও তাহাদের তুলনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এমন সুবোধ্য ভাষায় ও সরল ভঙ্গীতে বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠকগণ প্রবন্ধগুলি পাঠে বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন। বিশেষতঃ "জড়বাদ" ও "বস্তুরূপ" শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান সর্ব্বপ্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতগুলির সমন্বয়ে এমন চিত্তাকর্ষভাবে লিখিত রচনা বাংলা ভাষায় খুব অল্পই প্রকাশিত হয়। লেখকের ভাষায় ফারসী শব্দের উৎপাত নাই এবং অযথা উচ্ছ্বাসও নাই। ভাষা সর্ব্বত্র সরল, বিষয়োপযোগী ও সুখপাঠ্য। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই বেশ সুন্দর।

['প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৪২]

কারবালা

(১)

যে বয়সে অন্য মানুষ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের কথা ভাবে, অর্জিত সিদ্ধি ও যশের মূলধনে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিতে চায়, সেই বয়সে জনাব বরকতুল্লার এই অভিযান দুঃসাহসিক, এতে কোন সন্দেহ নাই। উল্লেখিত 'কারবালা' গ্রন্থে মননশীল লেখক কল্পনার প্রলেপে রহস্যময় কারবালার যুদ্ধ ও নবীবংশের ইতিবৃত্তের সঠিক সত্য ও তথ্য নিরূপণে প্রচেষ্ট হয়েছেন এবং এতে সাফল্য লাভ করেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে দীর্ঘ তেরো শত বৎসরে, গ্রন্থ আর গাথা রচিত হয়েছে প্রচুর। বাংলাদেশের পুঁথি-সাহিত্য আর জারীগান তো এতেই ভরপুর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙ্গালী নর-নারীকে করুণ রস পরিবেশন করে আসছে, কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মূল কানিহীর সাথে বহু ক্ষেত্রে গুজব ও কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। ভক্তদের লেখনীতে অনেক ক্ষেত্রেই এসে যুক্ত হয়েছে অতিরঞ্জন ও পক্ষপাতিত্ব। যে "বিষাদ সিন্ধু" দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলিম পরিবার-বন্দরে রসের বেসাতি বিলায়ে ফিরছে ওতেও ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ পীড়াদায়ক। উচ্ছ্বাসহীন সত্যনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক মন নিয়ে কারবালার ঘটনার সঠিক তথ্য নিরূপণই লেখককে উল্লেখিত গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছে। এব্যাপারে তিনি সৈয়দ আমীর আলী, অধ্যাপক হিট্টী, অধ্যাপক এম. খোদাবক্স, স্যার উইলিয়াম মুর, নিকলসন, খাজা হাসান নেজামী, অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন, অধ্যাপক মুহম্মদ ইস্‌হাক প্রমূখের ইংরাজী, উর্দু ও বাংলা 'ইসলামের ইতিহাস' পর্যালোচনায় এর মধ্য থেকে কল্পনা বিবর্জিত ভাবে সঠিক ঘটনাকে তুলে ধরেছেন।

জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক। তাঁর সারা জীবনের সাহিত্য সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য হইল সত্যনিষ্ঠা, ভাবের গভীরতা আর ভাষার ওজস্বিতা। উল্লেখিত গ্রন্থেও তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তি তাঁর স্বকীয়ত্বকেই প্রমাণ করেছে। আমরা তাঁর এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

--তোফাজ্জল হোসেন

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা আগষ্ট ১৯৫৮]

(২)

মোছলেম ইতিহাসের করুণতম কাহিনী- কারবালায় এমাম হোছায়েনের শাহাদাৎ বরণের সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ আলোচ্য 'কারবালা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে কারবালা করুণ কাহিনী অবলম্বনে এ যাবৎ যত বই প্রকাশিত হইয়াছে, সে-সবের একখানাতেও সম্ভবত

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য বইয়ের মতো সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশের চেষ্ট হয় নাই। 'কারবালা' এদিক দিয়া ব্যতিক্রম এবং একক। গ্রন্থকারকে এ বই লিখিতে গিয়া অনেকগুলি ইংরেজী, উর্দু বাঙলা প্রামাণ্য ইতিহাস ঘাঁটিতে হইয়াছে। শুধু কারবালা কাহিনী নয়, এ কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত সে সময়কার আরবের ইতিহাসও ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাশেমী ও উমাইয়া গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিহিংসা এর প্রাথমিক ইতিহাস, কারবালায় এই শোচনীয়তম পরিণতি- এ সব সুন্দর সাবলীল ভাষায় এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কারবালার কাহিনীতেই লেখক এ বই সমাপ্ত করেন নাই। জের হিসাবে মোখতারের ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণের ইতিহাসও বইয়ে বর্ণিত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, এমাম হোছায়েনের পরবর্ত্তী বংশধরদের প্রতি উমাইয়া খলিফাদের নির্ম্মম ও অমানুষিক আচরণের ঐতিহাসিক বিবরণও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

বিষয়বস্তু যেমন শোকাবহ, লেখকের ভাষাও তেমনি বলিষ্ঠ ও সাবলীল- ফলে 'কারবালা' পড়িতে উপাখ্যানের মতোই পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়। লেখক বইয়ের পরিশিষ্টে কারবালা ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে মিঃ খোদাবখস ও মিঃ মু'য়ের দুইটি দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বইয়ের মূল্য বাড়িয়াছে।

বইয়ের ছাপা কাগজ প্রথম শ্রেণীর। বাঁধাইও তেমন হইলে সুখের বিষয় হইত।

--নূরী

[আজাদ, ২৭ জুলাই, ১৯৫৮]

(৩)

কারবালা প্রান্তরের শোচনীয় ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের এক 'বিষাদময়' অধ্যায়। কারবালার সেই শোকস্মৃতি বারে বারে এসে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানের প্রাণে দুঃখ বিষাদের হাহাকারের দোলা দিয়ে যায়। কারবালার সেই বিষাদময় কাহিনী নিয়ে বাংলাদেশেও অসংখ্য গান গল্পের অভাব নেই। একদিকে যেমন মুক্তাল হোসেন, জঙ্গনামা প্রভৃতি মহাকাব্য, খন্ডকাব্য পর্যায়ের

Dhaka University Institutional Repository

বহু পুঁথি কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি 'বিষাদ সিন্ধু'র মতো বৃহৎ কাব্যোপন্যাসেও জন্ম নিয়েছে। ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক তথ্যের সংমিশ্রণেই কারবালা কাহিনীকে ভিত্তি করে বাংলাদেশে এক বৃহৎ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এবং এ সমস্ত কাব্য সাহিত্য যুগ যুগ ধরে অগণিত মুসলমানদিগকে তাদের হর্ষ-বিষাদের যোগান দিচ্ছে।

কিন্তু এ সমস্ত কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের মূল সত্য অনেক সময় চাপা পড়ে থাকে। গান গল্প ও কাব্য কাহিনী থেকে মূল কাহিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে কারবালা কাহিনী সাধারণ পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে না। আলোচ্য "কারবালা" গ্রন্থে লেখক ঐতিহাসিক ও গবেষকের দৃষ্টিতে ইসলামের ইতিহাসের সেই বিষাদময় অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। বরকতুল্লাহ সাহেবের সমগ্র সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রতি তাকালে দেখা যায়, তার পিছনে একটি দীর্ঘ অধ্যয়ন ও নীরব সাধনা রয়েছে। তাঁর বিদগ্ধতা, দার্শনিকতা গভীর জ্ঞান সাধনা, ভাষার শাণিত দীপ্তি এবং সর্বোপরি তাঁর মণীষাদীপ্ত প্রতিভার স্পর্শ পাঠক শ্রেণীকে মুগ্ধ করে। আর তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধনার তুলনায় তা কত অকিঞ্চিৎকর, তবে এ অল্প ক'টি গ্রন্থ থেকেই তাঁর সাহিত্যিক পরিমাপ এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন নির্ধারণ করতে অসুবিধা হয় না।

এ কারবালা গ্রন্থের মধ্যেও তাঁর গভীর জ্ঞাননিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কারবালার এই কাহিনী যে ইতিহাসের একটা খন্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে, তেমনি ইসলামের পরবর্ত্তী ইতিহাসের উপরও গভীর ছাপ ফেলে যায়। লেখকের অনুসন্ধিৎসু মন ইতিহাসের সেদিক উদ্‌ঘাটিত করেছে। কারবালা যুদ্ধের পটভূমিকা স্বরূপ তিনি নবীবংশের কাহিনী এবং কারবালার বিষাদময় পরিণতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইসলাম জগতে যে ক'টি যুদ্ধ বিগ্রহ সংগঠিত হয় তা'ও এ গ্রন্থে সংযোজন করেছেন, তাতে কারবালার মর্ম্ম কাহিনী বুঝতে অধিকতর সহায়ক হবে সন্দেহ নেই। বাইখানার সর্ব্বত্রই লেখকের নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনি ধরণের একখানা গ্রন্থে,

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে ভাবালুতা প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে সেখানে লেখক ঐতিহাসিক সত্যে দিকেই ঝুকে পড়েছেন। ইতিহাস ও সাহিত্যের মিলিত সমাবেশ- গ্রন্থখানি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করবে, এবং কারবালা কাহিনী, তার পটভূমি ও ইতিাসের পরবর্ত্তী অধ্যায়ের উপর সে কাহিনী কি ছাপ ফেলে যায়, তা জানতে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

নবীগৃহ সংবাদ

আলোচ্য বইটিতে লেখক নবীর জীবনের শৈশব থেকে শুরু করে নবীর মদীনা প্রস্থান পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মূলতঃ নবীজীবন ও নবীপরিবারকে কেন্দ্র করে বইটি লিখিত হলেও প্রাসঙ্গিকভাবেই তৎকালীন মক্কার সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ইসলামের ত্বরিৎ ক্রমবিকাশে বিবি খাদিজার মহৎ অবদান এবং তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য সম্পর্কে লেখকের সাবলীল ও অনাড়ম্বর বর্ণনা বইটীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

ইসলামের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশে মহৎ অবদানের জন্যই শুধু নয়, স্বীয় চারিত্রিক মাধুর্য, পতিভক্তি এবং আদর্শ নিষ্ঠার জন্য বিবি খাদিজা মানুষের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। গৃহিণী হিসেবেও তিনি বিশ্বের ইতিহাসে আদর্শ স্থাপন করে গেলেন।

জনাব বরকতুল্লাহ্ সাহিত্যিক। তাই তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে অক্ষুন্ন রেখেও সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ভাষার একটা সাবলীল গতিচ্ছন্দ ও মাধুর্য লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের প্রবন্ধধর্মী জীবনী গ্রন্থের জন্য বলিষ্ঠ শব্দ একান্ত প্রয়োজন। জনাব বরকতুল্লাহ শব্দচয়নের এই দিকটি সম্পর্কে সচেতন। তবে এই বইয়ে কিছু বানান ভূল লক্ষ্য করা গেছে। আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে ভুলগুলো সংশোধন করা হবে।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬০]

Dhaka University Institutional Repository

জ. প্রাপ্ত পুরস্কার ও খেতাব

১. বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (প্রবন্ধ শাখা-১৯৬০)

২. পাকিস্তান সরকারের সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব ও স্বর্ণপদক (১৯৬২)

৩. নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ গ্রন্থের জন্য দাউদ পুরস্কার (১৯৬৩)

৪. পাকিস্তান সরকারের president Medal for pride of performance পুরস্কার (১৯৭০)

৫. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৪-মরণোত্তর))

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. গোলাম সাকলায়েন, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

৩. মোহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা:স্টুডেন্ট ওয়েজ ১৯৬৪।

৪. আনিসুজ্জামান মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা: লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪।

৫. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, সাহিত্য সমীক্ষা, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬।

৬. ড. হাবিব রহমান, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ জীবন ও সাহিত্য সাধনা, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি বুককর্ণার, ১৯৯৮।

৭. বেগম নার্গিস জেরিনা খান, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রাঃ), ঢাকা, ১৯৯৯।

৮. আবদুস সাত্তার, ফারসী সাহিত্যের কালক্রম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৯।

৯. ড. শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী, (মুহম্মদ মমতাজ উদ্দীন অনুদিত) ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯।

১০. Ameer Ali, Syed. A short history of the saracens, Macmillan & co. ltd. London, 1953।

১১. মোহম্মদ নাসির উদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা, ১৯৭৫।

১২. আবদুল হক, মোহম্মদ বরকতুল্লাহরঃ দর্শন চর্চা, নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

১৩. আমিনুল ইসলাম, বরকতুল্লাহ, জগৎ জীবন দর্শন, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

১৪. হাবিবুর রহমান, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ: জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা: একুশের প্রবন্ধ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

১৫. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, পারস্য প্রতিভা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

১৬. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, মানুষের ধর্ম্ম, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, নবীগৃহ সংবাদ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

১৮. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

১৯. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

২০. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

২১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, জীবন স্মৃতি, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

২২. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ, হযরত ওসমান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

২৩. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

২৪. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (অনুবাদ: গোলাম সোবহান সিদ্দিকী), খেলাফত ও রাজতন্ত্র, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১।

২৫. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন সম্পাদক ড. এ.এইচ. এম মুজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা:) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮।

২৬. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

২৭. আকরাম ফারুক, ইমাম হোছাইনের (রা:) শাহাদাত, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৩।

২৮. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, ইসলামী সংগঠনে নেতা নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ঢাকা: আন্ নূর প্রকাশন, ২০০২।

২৯. হাবিব রহমান, মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর বার্ষিক অধিবেশন সভাপতিদের অভিভাষণ, ঢাকা: বাংলা একামেী, ২০০২।

৩০. আবুল কাসেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. ড. আবদুল হামিদ ও ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, মুসলিম দর্শন পরিচিতি, ঢাকা: পুথিঘর লি:, ১৯৯৬।

৩২. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৮।

৩৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

৩৪. ড. মুহাম্মদ মজিরউদ্দিন মিয়া, বাংলা সাহিত্যে রসূর চরিত (১২৯৫-১৯৮০), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

৩৫. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, ঢাকা: ঝিনুক পুস্তিকা।

৩৬. মওলানা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, আযমগড়, মাতবা মা'আরিফ, ১৯৫২।

৩৭. মোঃ রফিকুল ইসলাম খন্দকার, সংকলন: মওলানা আকরম খাঁ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪।

৩৮. Willams Henry Smith, Historions History of the world, 5th Ed, 1926.

৩৯. Zaki Ali Dr., Islam in the world, Lahore, 1947.

৪০. Hitti P.K. History of Syria, London, 1951.

৪১. হাফিজ আবু শায়খ আল ইসফাহানী (রহ:) আখলাকুন নবী (সঃ), ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০।

৪২. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

৪৩. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বঙ্গীয় মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

৪৪. অতুল চন্দ্র রায় এবং প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস, কলিকাতা: মৌলিক লাইব্রেরী, ২০০০।

৪৫. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭খ্রিঃ), ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭-২০০০, ঢাকা: নিউ এজ পাবিলিকেশন্স, ২০০১।

৪৭. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৪৮. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৭১, অর্থনৈতিক, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০।

৪৯. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা পিডিয়া, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

৫০. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১০ম খণ্ড, ১৯৮৮।

৫১. প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হামিদ, আধুনিক অর্থনীতি, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা:) লিমিটেড, ১৯৯৪।

৫২. নাসির উদ্দিন আহমেদ ও ড. মোহাম্মদ তারেক সম্পাদিত, উন্নয়ন অর্থনীতি, বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

৫৩. মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আননবী (রহ:), রিয়াদুস সালেহীন, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০।

৫৪. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (৩য় খণ্ড), ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০৪।

৫৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৯।

৫৬. সম্পাদনা পরিষদ, গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১।

৫৭. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২।

৫৮. আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আশ্‌রাফ আলী, বিশ্বনবী (সা:), ঢাকা: আনোয়ারা বুক হাউস, ২০০৪।

৬০. ইমাম গায্‌যালী (রহ:), অনুবাদ, আলহাজ্ব মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী, আখলাকে মুহাম্মদী (সা:), ঢাকা: ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয় ২০০৪।

৬১. মাওলানা এ.কে.এম. ফজলুর রহমান আনওয়ারী, হযরত ওসমান (রা:), ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি:, ১৯৯৯।

৬২. বেগম নার্গিস জেরীনা খান, উম্মুল মু'মুনীন হযরত খাদিজা (রা:), ঢাকা: বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি:, ১৯৯৮।

৬৩. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ:), অনুবাদ; মুহিউদ্দিন খান, সীরাতে রসূলে আকরাম (সা:), ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৪।

৬৪. মাওলানা খোন্দকার মোঃ বশিরউদ্দিন, বিশ্বনবীর জীবনী, ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ২০০১।

৬৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৩।

৬৬. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, ইসলামী নেতৃত্ব, ঢাকা: আন্ নূর প্রকাশন, ১৯৯৭।

৬৭. খন্দকার আবুল খায়ের, শহীদে কারবালা, ঢাকা: এ.জি. প্রকাশনী, ২০০৩।

৬৮. মোহম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, গোলাম মোস্তফা ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

৬৯. মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, মোহম্মদ আকরম খাঁ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

৭০. ভূঁইয়া ইকবাল, আবুল কালাম শামছুদ্দিন, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

৭১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, মুহম্মদ এনামুল হক, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।